PIYASA
A Bengali Novel By Nimai Bhattacharya
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

ISBN-81-7079-977-5

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপন : লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার রাজা

আমার মা নন্দিতা'কে

লেখকের অন্যান্য বই

চীনাবাজার
স্বপ্নভঙ্গ
এক চক্কর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
ফুটবলার
কেয়ার অফ ইন্ডিয়ান এম্বাসী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
শেষ পারানির কড়ি
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
অনুরোধের আসর
রাজধানী এক্সপ্রেস
রাজধানীর নেপথ্যে
ভায়া ডালহৌসী
অনেকদিনের মনের মানুষ
পিকাডিলি সার্কাস
ডিফেন্স কলোনী
পার্লামেন্ট স্ট্রিট
যৌবন নিকুঞ্জে
সাব-ইনস্পেক্টর
লাস্ট কাউন্টার
উইং কমান্ডার
প্রবেশ নিষেধ
হকার্স কর্নার
শ্রেষ্ঠাংশে
সেলিম চিস্তি
ভি আই পি
মেমসাহেব
ভালোবাসা
ডিপ্লোম্যাট
রিপোর্টার
অ্যালবাম
এডিসি
গোধূলিয়া
রিটায়ার্ড
পেন ফ্রেন্ড এন্ড ক্লাস ফ্রেন্ড
আকাশভরা সূর্য তারা
ওয়ান আপ টু ডাউন
এই আমি সেই আমি
মাতাল

অনুরাগিনী
গল্পসমগ্র — ১ম / ২য়
আগমনী
প্রতিবেশিনী

জার্নালিস্টের জার্নাল
একান্ত নিজস্ব
মোগলসরাই জংশন
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
ইওর অনার
পথের শেষে
চিড়িয়াখানা
ইমন কল্যাণ
ইনকিলাব
ব্যাচেলার
প্রিয়বরেষু
ককটেল
নিমন্ত্রণ
তোমাকে
সোনালী
ম্যাডাম
রবিবার
রত্না
কেরানী
নাচনী
বন্যা
অসমাপ্ত চিত্রনাট্য
নিউমার্কেট
নিউ এম্পায়ার ক্লাব
স্বার্থপর
কয়েদী
ফুটপাত
ভবঘুরে
শ্রেষ্ঠ গল্প
ভদ্দরলোক
পূজাস্পেশাল
প্রবাসী
ডার্লিং
সদরঘাট
প্রথম নায়িকা
চেক পোস্ট

পিয়াসা

।। প্রথম পর্ব।।

আজ আমাদের আদরের স্নেহের পিয়া ঠিক দশ বছরের হল। সত্যি কথা বলতে কি, ও শুধু আমার আর সার্থকের মেয়ে না ; ও আমাদের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত। আমাদের স্বপ্ন, সাধনা।

আজ আবার নতুন করে মনে পড়ছে পিয়া হবার দিনের অবিস্মরণীয় অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার স্মৃতি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই চমকে উঠলাম। সার্থক পাশ ফিরে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। আমি ডান হাত দিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, প্রিন্স! প্রিন্স! শিগগির মাকে ডাকো।

সার্থক লাফ দিয়ে উঠে বসেই আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞস করল, কী হয়েছে বেগম? এনিথিং সিরিয়াস?

—তুমি শিগগির মাকে ডাক দাও।

সার্থক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে প্রায় ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই শাশুড়ি ছুটে এলেন আমার কাছে। আমার পাশে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, কী বৌমা, ব্যথা করছে?

আমি দু'হাত দিয়ে ওনার গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, মা, আমার শাড়ি-সায়া ভিজে যাচ্ছে।

উনি কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াতেই খেয়াল হল, আমাদের ঘরের দরজার পাশেই বাবা আর সার্থক দাঁড়িয়ে। মা ওদিকে তাকিয়েই সার্থককে বললেন, বাবুল, শিগগির গাড়ি বের কর। বৌমাকে এক্ষুণি নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে।

মা বোধহয় একবার নিঃশ্বাস না নিয়েই বাবাকে বললেন, তুমি পূর্ণিমাদিকে টেলিফোন করে বলো, নার্সিং হোমে আসতে।

নার্সিং হোম যাবার পথে বাবা একটু হেসে আমাকে বললেন, বৌমা, আমার কথাটা মনে রেখো। আমি যেন একটা গার্ল ফ্রেন্ড পাই। এই বুড়ী বউকে আর

ভাল লাগছে না।

এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ব্যথা বেশ একটু বাড়লেও বাবার কথা শুনে একটু হাসি। কিন্তু মা একটু রাগ করেই বাবাকে বলেন, বৌমা ব্যথার জ্বালায় মরছেন আর তুমি আছো তোমার গার্ল ফ্রেন্ডের তালে!

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মা হওয়া যে কত কষ্ট, তা তো তোমরা বুঝবে না। এখন কোন ঠাট্টা-ইয়ার্কিই ভাল লাগে না।

বাবা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বললেন, তুমি যতই লেকচার দাও, আমি বলে দিচ্ছি, আমার গার্ল ফ্রেন্ড বৌমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেবে না।

—তোমার ছেলে হবার সময়ও আমার কষ্ট হয়নি, তোমর গার্ল ফ্রেন্ড হবার সময়ও বৌমার কষ্ট হবে না! চমৎকার!

নার্সিং হোমে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ পূর্ণিমা চ্যাটার্জি এসে হাজির। আমাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই উনি এক গাল হাসি হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অর্পিতা, কী চাও? ছেলে না মেয়ে?

তখন ব্যথাটা বেশ বেড়েছে কিন্তু তবু আমি একটু হেসে বললাম, আমার শ্বশুর মশাই একটা গার্লফ্রেন্ড পাবার জন্য পাগল।...

কথাটা শেষ করার আগেই উনি বললেন, সার্থক কী চায়?

—সে তো মেয়ে হবে বলে তার নাম পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে।

ডাক্তার মাসি একটু হেসে বললেন, কী নাম ঠিক করেছে?

—পিয়াসা।

—বাঃ! চমৎকার নাম।

আমি দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে একটু সলজ্জ চাপা হাসি হেসে বললাম, ও তো আজকাল আমাকে হরদম পিয়ার মা—পিয়াসার মা বলে ডাকে।

উনি একটু খুশির হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শাশুড়ি নাতি না নাতনী পেলে খুশি হবেন?

—উনি শুধু ঠাম্মা হবার জন্য হা করে বসে আছেন।

এবার ডাক্তার মাসি আমার মুখের সামনে মুখ রেখে চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আর তুমি কী চাও?

আমি ওনার চোখের পর চোখ রেখে বললাম, মাসি, আমি মা হতে চাই।

আনন্দে খুশিতে উনি আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, অর্পিতা, আর একটু পরেই তুমি মা হবে।

অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে ডাক্তার মাসি কথাবার্তা বলে আমাকে ভুলিয়ে রাখলেও আমি নিশ্চয়ই অব্যক্ত অসহ্য বেদনায় ছটফট করছিলাম কিন্তু এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হল, মহাষ্টমীর সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে চারদিকে। আর ধূপের ধোঁয়ায় ভরে গেছে পূজামণ্ডপ। আমি বোধহয় বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম সন্ধ্যারতি দেখতে।

তারপর হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম, ডাক্তার মাসি বললেন, দেখলে তো অর্পিতা, তুমি সত্যি সত্যি মা হয়ে গেলে।

পরে শুনেছিলাম, তখন ঘড়িতে ন'টা দশ বাজে।

আমাকে কেবিনে দেবার পর মা এসেছিলেন কিন্তু আমি কোন কথাবার্তা বলতে পারিনি। তবে বিকেল বেলায় ভিজিটিং আওয়ার্সের সময় আমি অনেকটা সামলে নিয়েছিলাম!

ঐ ভিজিটিং আওয়ার্সের সময় বাবা এক গাল হাসি হেসে বললেন, বৌমা, সত্যি করে বলো তো আমার গার্ল ফ্রেন্ড তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে কি না।

উনি মুহূর্তের জন্য হেসে বললেন, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার গার্ল ফ্রেন্ড কখনই তোমাকে কষ্ট দেয়নি।

মা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বললেন, না, না, বৌমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। বাচ্চা হতে আবার মেয়েদের কষ্ট হয় নাকি!

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আজ যখন দিল্লীতে ফোন করে নাতনী হবার খবর দিলে, তখন বেহান প্রথমেই কি বলেছিলেন?

বাবা একবার ঢোক গিলে প্রায় জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন, বৌমা খুব কষ্ট পেয়েছেন কি না। তা আমি...

'যারাই মা হয়েছে, তারাই ঐ প্রশ্ন করবে।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে একটু রাগ করেই বলেন, তোমরা পুরুষরা কোনদিনই বুঝবে না, মা হওয়া কত কষ্টের।

সার্থক মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের এই আলোচনায় যোগ দিতে পারে না।

তবে মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার পর মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে যাবার দু'চার মিনিট পরই সার্থক হঠাৎ ফিরে আসে। কোন ভূমিকা না করে ও দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা ধরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপরাধীর মত প্রশ্ন করে, বেগম, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না? আই অ্যাম সরি!

এবার আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে প্রশান্ত হাসি হেসে বলি, প্রিন্স, বিশ্বাস করো, আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি।

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলি, যতটুকু কষ্ট পেয়েছি, তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি আনন্দ পেয়েছি।

—রিয়েলি বেগম?

ও অবিশ্বাস্য আনন্দ ভরা উজ্বল দুটো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

আমিও ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, তোমাকে যে আমি পিয়াসাকে দিতে পেরেছি, তাতে যে আমার কি আনন্দ হয়েছে, তা আমি বলতে পারবো না।

সার্থক একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়েই আমার ডান হাতে একটা চুমু দিয়েই ঝড়ের বেগে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি তখন আনন্দে খুশিতে ভরপুর হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে বেবি কটে ঘুমন্ত পিয়াকে দেখি।

ওকে দেখতে দেখতেই হঠাৎ মনে হলো, এইত সেদিন সার্থকের সঙ্গে আলাপ হলো।...

সেদিন রবিবার। বাবা অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য দিল্লীর বাইরে গিয়েছেন। সকাল 'বেলায় ব্রেক ফাস্ট খাবার সময় মা আমাকে বললেন, 'হ্যারে ময়না, তুই কোথাও বেরুবি না তো?

—না, না, আমি কোথাও বেরুব না। আমার অনেক নোটস্ টুকতে হবে।

—আমার এক পুরনো বন্ধু হঠাৎ কালকে ফোন করেছিল। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

—তোমার কোন পুরনো বন্ধু...

—তুই চিনবি না।

মা একটু থেমে বলেন, এই মালতী আমার সঙ্গেই বেথুন থেকে ম্যাট্রিক আর আই. এ পাশ করে। তারপর ওর বিয়ে হয়ে চলে যায় জলপাইগুড়ি। সেই থেকে ওর সঙ্গে

আমার আর দেখা হয়নি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, সে তো মান্ধাতার আমলের ব্যাপার! এত বছর পর তিনি তোমার খবর পেলেন কী করে?

—দিন দশেক আগে কলকাতায় এক নেমন্তন্ন বাড়িতে ছায়ার সঙ্গে ওর দেখা

—ও তাই বলো।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলি, ছায়া মাসি ছাড়া তো আর কোন বন্ধুর সঙ্গেই তোমার যোগাযোগ নেই।

—থাকবে কী করে? সংসার করতে গিয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?

মা বেরুবার আগে বললেন, আমি দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই ফিরে আসব। এর মধ্যে যদি তোর বাবা ফোন করে, তাহলে জেনে নিস কবে ফিরবে।

—আচ্ছা।

নোটস্ টোকা শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। মনে মনে একটু হাসি আর ভাবি, দুই বন্ধুতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন।

হঠাৎ ভগবতী এসে জিজ্ঞেস করল, দিদি, চায় পিয়েঙ্গে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চা কর। নোটস্ টুকতে টুকতে মাথা ধরে গেছে।

চা খেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি আর ভগবতীর সঙ্গে কিছুক্ষণ বক বক করার পর আমি স্নান করার জন্য বাথরুমে গেলাম। গুণ গুণ করে গান গাইতে বাথরুম থেকে বেরুবার পর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মনে হলো, নিচে মা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে।

আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি, মা, কার সঙ্গে কথা বলছো?

মা একটু গলা চড়িয়ে উত্তর দিলেন, সাহানা এসেছে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে চুল আঁচড়ানো বন্ধ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই চিৎকার করে গেয়ে উঠি—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে
তোদের মতো মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি...

ড্রইংরুমে পা দিতেই সাহানার সঙ্গে এক ভদ্রলোককে দেখেই আমার গান থেমে যায়। থমকে দাঁড়াই।

সাহানা আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসি হেসে বলে, আয়, আয়। অত লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।

ও একবার আড় চোখে বাঁ দিকের ভদ্রলোককে দেখে হাসতে হাসতেই বলল, আমার মাসতুতো ভাই।

সাহানার মাসতুতো ভাই মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে মাকে বলেন, মাসিমা, আজ আমি আসি। পরে একদিন আসব।

মা বললেন, না, না, আজকে তোমাকে হস্টেলে খেতে হবে না। এখানে খাওয়া-দাওয়া করে হস্টেলে যাবে।

সাহানা ওকে বলল, রাঙাদা, খেয়ে যা, খেয়ে যা। এটাও আমার একটা বাড়ি।

ও আমার হাত ধরে একটু কাছে টেনে নিয়ে ওকে বলল, এই অর্পিতা আর আমি একই বৃন্তে দুটি ফুল!

ড্রইংরুমে পা দিয়েই সাহানার পাশে ভদ্রলোককে দেখে সত্যি অবাক হয়েছিলাম। সন্দেহ করেছিলাম, উনি বোধহয় সাহানার বয় ফ্রেন্ড কিন্তু এই বয় ফ্রেন্ডের কথা আমাকে কিছু বলেনি বলে বেশ অভিমানও হয়েছিল। ভদ্রলোক যে ওর মাসতুতো ভাই তা জেনে যেন স্বস্তি পেলাম।

আমি, সাহানা আর ওর মাসতুতো ভাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। মা পরিবেশন করতে করতেই ওকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তোমার নাম কী?

—মাসিমা, আমার নাম সার্থক চৌধুরী।

—বাঃ! চমৎকার নাম।

সাহানা খুশির হাসি হেসে বলল, মাসিমা, রাঙাদা শুধু লেখাপড়ায় না, স্বভাব-চরিত্র আলাগা ব্যবহার সব দিক দিয়েই সার্থক।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, রাঙাদাকে আমি যেমন ভালবাসি, সেইরকমই শ্রদ্ধা করি।

মা বললেন, এইরকম ছেলেমেয়েদের দেখলেও প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

সাহানা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, জানেন মাসিমা, আমার বাবা-মা কি বলেন?

—কী বলেন?

—বলেন, তোর বদলে যদি তোর রাঙাদা আমাদের ছেলে হতো...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সার্থক বলে, আঃ! বুলা! কি বক বক করছিস।

দু'চার মিনিট পর মা জিজ্ঞেস করলেন, সার্থক, তুমি কি আই-আই-টি'তে বি . টেক করছো?

সার্থক অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে জবাব দিল, মাসিমা, আমি খড়গপুর থেকে বি. টেক

করে এখানে এম. টেক করছি।

সাহানা সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে বলে, জানেন মাসিমা, রাঙাদা বি. টেক' এ অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করে আমেরিকা যাবার সুযোগ পেয়েও গেল না।

মা বললেন, সার্থক, আমেরিকা গেলে না কেন? এখানকার চাইতে ওখানে তো অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পেতে।

সার্থক একটু চাপা হাসি হেসে বলে, এখানেও কী কম সুযোগ?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি মা-বাবার এক মাত্র সন্তান। আমি আমেরিকা চলে গেলে তাদের কে দেখবে?

সার্থক প্রায় না থেমেই একটু হেসে বলে, তাছাড়া আমেরিকায় গেলে তো আপনার মত মাসিমার কাছে এত আদর-যত্ন করে খাওয়া-দাওয়ার তো সুযোগ পেতাম না।

মা বললেন, কি আর আদর-যত্ন করলাম বাবা! যা রান্না হয়েছিল, তাই খেতে দিলাম।

—মাসিমা, যারা বছরের পর বছর হস্টেলে থাকে, শুধু তারাই জানে, আপনাদের এইসব অতি সাধারণ রান্নাবান্নারও কি দাম!

—যখনই ইচ্ছা করবে, তখনই চলে এসো। আমাদের এই সাউথ এক্সটেনশন থেকে তোমাদের আই-আই-টি তো বেশি দূরেও না।

সার্থক কিছু বলার আগেই সাহানা বলল, জানেন মাসিমা, দিল্লীতে আসার পর রাঙাদা আজ দ্বিতীয় দিন আমাদের বাড়ি এসেছিল।

সার্থক বলল, মাসিমা, তিন মাস অন্তর আমাদের পরীক্ষা। এত চাপের মধ্যে থাকতে হয় যে ইচ্ছে থাকলেও বেরুতে পারি না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর মা বললেন, সার্থক, শত কাজকর্ম থাকলেও এই মাসির কাছেও মাঝে মধ্যে আসতে হবে।

সার্থক একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, মাসিমা, আসব।

ও বিদায় নেবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শুধু মাসিমার স্নেহ আর খাবার-দাবারের লোভে না, আপনার গান শোনার জন্যও আমাকে আপনাদের বাড়ি আসতে হবে।

সাহানা হাসতে হাসতে বলল, রাঙাদা, একটু সাবধান থাকিস। অর্পিতা গান শুরু করলে কিন্তু থামতে জানে না।

ওর কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি।

না, সার্থককে দেখেই আমি প্রেমে পড়িনি ; তাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে স্বপ্নরাজ্যেও ভেসে যাইনি! তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্বীকার করবো, ওকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে আমার ভাল লেগেছিল।

যে সসম্মানে বি. টেক পাশ করে এম. টেক পড়ছে, সে যে নিশ্চয়ই কৃতী ছাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না কিন্তু সব কৃতি ছাত্র-ছাত্রীই যে আদর্শবান, চরিত্রবান বা ভাল মানুষ হবেই, তার তো কোন কারণ নেই।

ছোটবেলায় বিশ্বাস করতাম, যারা লেখাপড়ায় ভাল হয়, তারা সবদিক দিয়েই ভাল হয়। আমার বন্ধু নীতা আমার ভুল ভেঙে দেয়।

সাহানার মত নীতাও আমারই সঙ্গে লেডি আরউইন স্কুলের ক্লাশ ফাইভ'এ ভর্তি হয়। নীতা প্রত্যেক বছর ফার্স্ট বা সেকেণ্ড হয়ে ক্লাশে উঠতো। ক্লাশ এইটের অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় ওর পক্স হয়েছিল। ঐ অসুস্থতার মধ্যে পরীক্ষা দিয়েও নীতা ফোর্থ হয়েছিল। সেকেন্ডারী ও হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ও অভাবনীয় ভাল রেজাল্ট করেছিল।

নীতা নাচ-গান জানতো না। স্পোর্টস'এ কোন প্রাইজও কোনদিন পায়নি কিন্তু নাটকে অসম্ভব ভাল অভিনয় করতো। লেডি আরউইন'এর পুরনো টিচাররা এখনও গর্বের সঙ্গে ওর কথা বলেন।

হায়ার সেকেন্ডারী পাস করার পর আমরা দশ-বারোজন বন্ধু ভর্তি হলাম লেডি শ্রীরাম কলেজে। ছুটির পর আমরা বন্ধু-বান্ধবরা কিছুক্ষণ আড্ডা না দিয়ে কোনদিনই বাড়ি যেতাম না। প্রথম দু'এক মাস নীতা সে আড্ডায় যোগ দিলেও পরে কোন না কোন অছিলায় ও আড্ডা না দিয়ে কলেজ থেকে চলে যেত। তারপর একদিন আমরা কয়েকজন কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা ছেলে খুব জোরে মোটর সাইকেল চালিয়ে এসে হঠাৎ কলেজের সামনের বাস স্ট্যান্ডে মুহূর্তের জন্য থামতেই নীতা তার পিছনে চড়ে চলে গেল।

পরের দিন আমাদের দু'একজন বন্ধু ওকে ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই নীতা বলেছিল, দাদা বলেছিল, আমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু ওর স্কুটারের একটা চাকা হঠাৎ পাংচার হওয়ায় ওর বন্ধু রাজীবদাকে পাঠিয়েছিল।

সেদিন ওর কথা আমরা অবিশ্বাস করিনি কিন্তু দিন দশেক পরে অদিতি কলেজে এসেই আমাদের কয়েকজনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, তোরা ভাবতে পারবি না, কাল বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে নীতাকে কি অবস্থায় দেখলাম।

আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করি, কার সঙ্গে কি অবস্থায় দেখলি?

—আমার ছোটমাসি-মেসো ওদের ছোট্টা দুটো ছেলেকে নিয়ে কলকাতা থেকে সোজা রাজস্থান গিয়েছিলেন। পরশু দিনই ওরা দিল্লীতে এসেছেন।

অদিতি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, কাল কলেজ থেকে ফেরার পরই ঐ মাসি-মেসোদের সঙ্গে বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আমাদের মধ্যে কে একজন প্রশ্ন করে নীতাও বুঝি কোন ছেলের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল?

—আমার ঐ মাসতুতো ভাই দুটো ভীষণ দুরন্ত। ওখানে গিয়েই ওরা বার বারই এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল...

—আসল ব্যাপারটা আগে বল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি।

অদিতি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঐ বাচ্চা দুটোকে ধরে আনতে মাসি-মেসো হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বলে আমি সেবার ওদের ধরতে গিয়েই দেখি, একটা ঝোপের পাশে একটা ছেলে নীতার কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে।

—মাই গড!

সাহানা জিজ্ঞেস করল, তোকে নীতা দেখতে পেয়েছিল।

—না, বোধহয়।

অদিতি একটু হেসে বলে, আমি ওকে ঐ অবস্থায় দেখেই লজ্জায় সরে এলাম।

—ছেলেটা কী রাজীব?

—কে রাজীব?

—ঐ যে ছেলেটার মোটর সাইকেলের পিছনে বসে নীতা মাঝে মাঝেই বাড়ি যায়।

—তোরা ওকে মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে যেতে দেখলেও আমি দেখিনি।

সপ্তাহ খানেক পরে কলেজের সামনের বাস স্ট্যান্ড থেকে নীতাকে মোটর সাইকেলের পিছনে বসে চলে যেতে দেখেই অদিতি প্রায় চিৎকার করে আমাদের বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ছেলেটাই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল।

কথায় আছে, চোরের দশ দিন, সাধুর একদিন। তাইতো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা ওদের অনেক কিছুই জানতে পারলাম।

সেদিন কলেজে যেতেই সাহানা এক গাল হাসি হেসে বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলল, জানিস অর্পিতা, কাপুর আংকল আর আন্টি কয়েক দিনের জন্য ব্যাঙ্গালোর গেলেন বলে মীনাকে আমাদের বাড়িতে রেখে গিয়েছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

সাহানা একটু থেমে বলে, কাল বাবা অফিস থেকে ফিরেই মাকে খবরটা দেবার ঘণ্টা খানেক পরই আংকল আর আন্টি এসে ওকে আমাদের এখানে পৌঁছে দিলেন।

—মীনা ক'দিন তোদের ওখানে থাকবে?

—বোধহয় দিন সাতেক।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তুই মাসিমাকে বলবি, পরশু কলেজের পর আমার সঙ্গে গিয়ে একেবারে সোমবার কলেজ করে ফিরে যাবি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুই না বললেও মীনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি রবিবার সকালে ঠিকই তোদের বাড়ি যেতাম।

সাহানারা যখন লাজপত নগরে থাকতো, তখন ওদের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন কাপুর আংকলরা। কাপুর আংকল মেসোমশাইকে ঠিক বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। আন্টিও মাসিকে বড় বোনের মত ভালবাসতেন। তাইতো দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তখন আমরা সবাই ছোট। তারপর ওদের সম্পর্ক যত গভীর হয়েছে, মীনার সঙ্গে আমার আর সাহানার বন্ধুত্বও তত নিবিড় হয়েছে।

মেসোমশাই সফ্‌দারজং এনক্লেভে নিজের বাড়িতে উঠে আসার বছর খানেকের মধ্যেই কাপুর আংকলরা ওয়েস্ট প্যাটেল নগরের ফ্ল্যাটে চলে যান। তারপর থেকে আমাদের দেখাশুনা বিশেষ না হলেও আমাদের তিনজনের বন্ধুত্ব ঠিকই আছে।

সে যাইহোক, রবিবার সাহানার অ্যালবামে একটা ছবি দেখেই জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটা কে রে?

আমি আর সাহানা প্রায় একই সঙ্গে বলি, আমাদের বন্ধু নীতা।

ও প্রায় অবিশ্বাসের সুরে আমাদের জিজ্ঞেস করে, ও সত্যি তোদের বন্ধু?

সাহানা একটু হেসে বলল, ক্লাস ফাইভ থেকে ও আমাদের সঙ্গে পড়েছে, এখনও আমাদের সঙ্গে পড়ছে।

তারপর মীনার কাছ থেকেই আমরা অনেক কিছু জানলাম। জানলাম, রাজীবের বাবার কাপড়ের দোকান আছে চাঁদনী চকে ; ওর মা গাজিয়াবাদের একটা স্কুলের টিচার। মীনাদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের বাড়িটাই ওদের। রাজীব সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ফেল করার পর আর পড়াশুনা করেনি।

আরো জানলাম, বাবা-মা ঠিক সাড়ে আটটায় বেরিয়ে গেলেও রাজীব দোকানে যায় দশটা-সাড়ে দশটায়। ঘণ্টা দুয়েক দোকানে কাটাবার পরই ও বাড়িতে খেতে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারপর সন্ধের দিকে ও আবার দোকানে যায়।

মীনা বলেছিল, রাজীবের বাবা-মা দুজনেই বেশ ভাল কিন্তু ছেলেটা নাথিং বাট এ প্লে বয়। কত মেয়ে যে ওর বন্ধু, তার ঠিকঠিকানা নেই।

ও একটু থেমে একটু হেসে বলেছিল, তোদের এই নীতাও ওর একজন গার্ল ফ্রেন্ড। মাসে অন্তত দু' তিন দিন রাজীব ওকে ওদের ফ্ল্যাটে এনে সারা দুপুর ধরে স্ফূর্তি করে।

ওর কথা শুনে আমি আর সাহানা চমকে উঠি। প্রায় একই সঙ্গে বলি, বলিস কীরে?

মীনা হাসতে হাসতে বলে, তোরা এই ছবিটা মাকে দেখালেই জানতে পারবি, আমি সত্যি কথা বলছি কি না।

এর পর এম. এ. পড়ার সময় আমাদের চোখের সামনে নীতা ছেলেদের সঙ্গে যে ধরনের কাণ্ড-কারখানা করতো, তা আমাদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধ দিনের জন্য এখানে-ওখানে চলে যাওয়া ছিল ওর নিয়মিত অভ্যাস। তবু নীতা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল বলে ওর বাবা-মা ওকে বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না।

সাহানা আর মাধুরী অবশ্য বলতো, প্রফেসর চোপড়া বা শ্রীবাস্তবের মত ছোকরা অধ্যাপকদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে মুসৌরী বা বাদ্‌খাল লেকে রাত কাটাতে পারলে আমরাও হাসতে হাসতে ফার্স্ট ক্লাস পেতাম।

বাবার এক কলিগ' এর ছেলে এম. বি. বি. এস পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পাবার পর এম. এস. পরীক্ষাতেও অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করল কিন্তু অমন নেশাখোর ছেলে বোধহয় ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

এইসব অভিজ্ঞতার জন্য সার্থককে প্রথম দিন দেখেই আমি খুব বেশি উল্লসিত হইনি, হতে পারিনি। কথাবার্তা শুনে ওকে যথেষ্ট সংযত ও ভদ্র মনে হয়েছিল। তবে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো, ওর চোখ-মুখের মাধুর্য আমাকে বোধহয় মুগ্ধ করেছিল।

সেদিন সার্থক চলে যাবার পর মা বললেন, বুঝলে সাহানা, তোমার এই রাঙাদাকে দেখে বড় ভাল লাগল। আজকাল ঠিক এই ধরনের ছেলে বিশেষ চোখেই পড়ে না।

সাহানা চাপা খুশির হাসি হাসতে হাসতে বলল, মাসিমা, রাঙাদা তো আমার আইডল, আমার দেবতা।

ওরা দু'জনে ঘণ্টা খানেক ধরে শুধু ওকে নিয়েই আলোচনা করে চলেছে দেখে আমি টিপ্পনী কাটি, দ্যাখ সাহানা, তোর রাঙাদাকে নিয়ে অত অহংকার করিস না। জানিস তো, মিষ্টি আমেই বেশি পোকা লাগে ; টক আমে কোনদিনই...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাহানা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, ওরে, আমার রাঙাদা স্টেনলেস্ স্টিল। হাজার ঝড়-বৃষ্টিতেও ওর মরচে ধরবে না। হি ইজ অল টুগেদার এ ডিফারেন্ট মেটাল!

আমি একটু হেসে বললাম, লেট আস অল হোপ সো।

দিন তিনেক পর বাবা ফিরে এলে রাত্রে খাবার টেবিলে মা বাবাকে সার্থকের বিষয়ে অনেক কথা বললেন। বাবা শুধু বললেন, ভবিষ্যতে সুযোগ হলে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করবো।

সপ্তাহ খানেক পর থেকেই মা মাঝে মাঝেই আমাকে শুনিয়ে আপনমনে বলেন, সার্থক বলেছিল আসবে কিন্তু আসছে না কেন বুঝতে পারছি না।

আবার কখনও কখনও বলেন, ছেলেটা তো বাজে কথা বলার মানুষ না। ছেলেটা পড়াশুনায় ব্যস্ত নাকি শরীরটরীর খারাপ হলো বুঝতে পারছি না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, অত চিন্তা না করে একেবারে ডাঃ সাহাকে নিয়েই আই-আই-টি হস্টেলে চলে যাও না!

মা বেশ রাগ করেই বলেন, বাজে ফাজলামি করিস না।

সাহানা মাঝে-মধ্যে যখনই আসে, তখনই মা জিজ্ঞেস করেন, সার্থকের কী খবর? ও আসবে বলেও তো আর এলো না।

সাহানা হাসতে হাসতে বলে, মাসিমা, রাঙাদা নিজের লেখাপড়া কাজকর্ম নিয়ে এমনই মেতে থাকে যে তখন ও আমাদের কারুর কথাই মনে রাখে না।

—এর মধ্যে তোমাদের বাড়িতে আর আসে কি?

—না মাসিমা, এই মাস দুয়েকের মধ্যে ও আর আমাদের বাড়ি আসেনি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তবে বাবা-মা দিন দশেক আগে একদিন হস্টেলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ও ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, ভালই আছে; তবে সামনের সপ্তাহে ওর থার্ড সেমেস্টারের পরীক্ষা নিয়ে

দিন পনের পরের কথা। ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছেই জানতে পারলাম, প্রফেসর প্রসাদ মারা গিয়েছেন বলে ক্লাস হবে না। কিছুক্ষণ গল্পগুজব আড্ডা দেবার পর এক দল সিনেমা দেখতে গেল আর আমরা কয়েকজন কনট সার্কাস হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বাসে উঠলাম।

একে হাতে প্রচুর সময়, তার উপর কনট সার্কাস! সঙ্গে সঙ্গেই কি বাস বদল করে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে? না, আমরা সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাস ধরি না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনেকগুলো দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করার পর আইসক্রিম খেয়ে আমরা যে যার
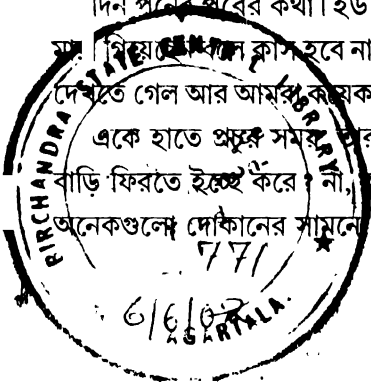
বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছেতেই এই ভরদুপুরে ড্রইংরুমের দরজা খোলা দেখে অবাক হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি, এই অসময়ে নিশ্চয়ই কোন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আসেননি, আসতে পারেন না। বোধহয় কোন নাছোড়বান্দা সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ এসে মাকে নতুন কোন প্রোডাক্ট গছাবার চেষ্টা করছে!

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতেই মা একগাল হাসি হেসে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ কে এসেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিক ফিরে সার্থক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, মোটে ঘণ্টা চারেক ধরে মাসিমার সঙ্গে গল্প করছি।

—ভালই করেছেন। মা তো আপনাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

—হবেনই তো ; মা-মাসিরা তো আপনাদের মত হিসেব নিকেশ করে ভালবাসতে পারেন না।

সার্থকের কথা শুনে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েই একটু হেসে বলি, মা-মাসিরা যে উদারতা দেখাতে পারেন, আমাদের পক্ষে তা কি সম্ভব? নাকি উচিত?

—সম্ভব-অসম্ভব উচিত-অনুচিত, এসব আপনার ব্যাপার। তবে মা-মাসিদের কাছে যে উদারতা প্রত্যাশা করি, তা আপনাদের মতো মেয়েদের কাছে কখনই আশা করি না।

—আমাদের বয়সী ছেলেদের কাছে সে উদারতা আশা করেন?

—বোধহয় করি।

—কেন? মেয়েদের চাইতে ছেলেরা বুঝি বেশি উদার হয়?

—অন্যের সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে যেভাবে ছেলেরা জড়িয়ে পড়তে পারে, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, আপনার মত মেয়েরা কখনই তা পারবে না।

—অন্যদের বিপদে-আপদে জড়িয়ে পড়লে যে আমাদেরই ক্ষতি হবে না, তা কে বলতে পারে?

সার্থক আপন মনে একটু হেসে বলে, আসল কথা হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজেদের উপর আস্থা বা আত্মবিশ্বাস নেই বলেই কাল্পনিক ভয়ে আপনারা অনেক কিছুই করতে পারেন না বা করেন না।

এতক্ষণ চুপ করে আমাদের দু'জনের কথাবার্তা শোনার পর মা বললেন, হ্যাঁ সার্থক, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নেই বলেই আমরা বাবা-দাদা-স্বামী-পুত্রের উপর এতটা নির্ভরশীল থাকি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করি, না, না, কখনই তা নয়। আত্মবিশ্বাস না থাকলে মেয়েরা ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজ করছে কীভাবে? আত্মবিশ্বাস আছে বলেই তো আজকাল

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মেয়ে-বউ হাজার ধরনের চাকরি-বাকরি করতে পারছে।

সার্থক আবার একটু হেসে বলে, যারাই চাকরি-বাকরি করে, তাদেরই যে আত্মবিশ্বাস আছে, একথা আপনাকে কে বলল?

ও প্রায় না থেমেই বলে, লেট আস এগ্রি টু ডিস এগ্রি।

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে থাকুন, আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে থাকি।

—সংঘাত সংঘর্ষ এড়িয়ে যদি আমরা নিজের নিজের বিশ্বাস নিয়ে থাকতে পারি, তাহলেই তো সমাজ-সংসার আনন্দে ভরে উঠবে।

মা সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন, বাঃ! কি সুন্দর কথা বললে সার্থক!

আমি টিপ্পনী কাটি, দেখো মা, সব তত্ত্বকথা শুনতেই ভাল লাগে কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এইসব তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

সার্থক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, আপনি যদি আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বিশ্বাস বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন অথবা ওরা যদি ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ জোর করে আপনার উপর চাপিয়ে না দেন, তাহলেই দেখবেন সমাজ-সংসার কত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—সে সংযম আমাদের ক'জনের আছে?

সার্থক হাসতে হাসতে বলল, দ্যাটস্ রাইট! তবে দেখবেন, যার আত্মবিশ্বাস আছে, তার সংযমও আছে।

সেদিন সার্থক চলে যাবার পর মা বললেন, ছেলেটাকে যত দেখছি, আমার তত বেশি ভাল লাগছে।

আমি একটু হেসে বললাম, যে কোন ছেলেমেয়ে তোমাকে একটু 'মাসিমা' 'মাসিমা' করলেই তো তুমি তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠো।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, তবে সাহানার এই দাদার সঙ্গে তর্ক করে আনন্দ আছে।

এই ভাবেই সার্থকের আমার আলাপ-পরিচয় শুরু হয়েছিল। ও দু'তিন মাস অন্তর আমাদের বাড়িতে এসে দু'এক ঘণ্টা কাটিয়ে যেত। কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা হতো, কোনদিন হতো না। দু'একবার সাহানাদের বাড়িতেও ওর সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয়েছে। এইভাবেই বছরখানেক কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ সাহানার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। মাসিমা বললেন, রবিবারের

আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেখে তোমার মেসোমশাইকে না জানিয়েই একটা চিঠি লিখেছিলাম। সঙ্গে তোমার বন্ধুর একটা ছবিও পাঠিয়েছিলাম।...

আমি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করি, ওরা কী বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

—ছেলেটি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র। মাস কয়েকের মধ্যেই ফুল ব্রাইট স্কলার হয়ে আমেরিকা যাবে দু'বছরের জন্য। তারপরও বোধহয় আরো দু'তিন বছর ওখানে থাকতে হবে। তাই...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি হাসতে হাসতে বলি, যাই বলুন মাসিমা, আপনি বিজ্ঞাপন দেখে ঐ চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো অজয়দার মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলের সঙ্গে সাহানার বিয়ে ঠিক হলো।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তবে সবই তো বিধির বিধান।

যাইহোক মাস তিনেকের মধ্যেই অজয়দার সঙ্গে সাহানার বিয়ে হবার পর পরই ওরা আমেরিকা চলে গেল।

সাহানার বিয়ে হবার কিছুদিন পর থেকেই মা প্রায়ই বাবাকে বলেন, এবার তুমিও একটু উঠে-পড়ে লাগো মেয়েটার জন্য একটা ছেলে দেখতে।

বাবা বলেন, আগে মেয়েটাকে এম. এ. পাস করতে দাও। তারপর নিশ্চয়ই বিয়ে দেব।

মা একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, ময়না এম. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি তুমি সুপাত্র পেয়ে যাবে?

বাবা গম্ভীর হয়ে বলেন, এখন বিয়ে-থা নিয়ে বেশি মাতামাতি শুরু করলেই মেয়েটার রেজাল্ট খারাপ হবে, তা জানো?

এইভাবেই দু'তিন মাস কেটে যায়।

সেদিন রাত্রে মা বাবাকে খেতে দিতে দিতেই জিজ্ঞেস করলেন, ময়নার বিয়ের ব্যাপারে তুমি কি কাউকে কিছু বলেছ?

—না।

বাবা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, সার্থককে তো তোমার খুব ভাল লাগে। তুমি তার সম্পর্কে তো ওর মাসিকে...

বাবাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বললেন, ময়নাকে তো সাহানার মা-বাবা

দু'জনের খুব ভালবাসেন। সেরকম বুঝলে ওঁরাই কিছু বলতেন।

মা একটু থেমে বলেন, আমার মনে হয়, সার্থকের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বলেই ওরা কিছু বলেননি।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

পরের দিনই সন্ধের পর হঠাৎ সার্থক এসে হাজির। বাবা-মা'কে প্রণাম করেই ও এক গাল হাসি হেসে পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে বলল, মাসিমা, একটু আগেই টেলিগ্রাম পেলাম, বাবা-মা কাল ডিলুক্স এক্সপ্রেসে এসে পৌঁছবেন। তাই মাসি-মেসোকে খবরটা দিতে যাবার পথে মনে হলো, আপনাদেরও জানিয়ে যাই।

মা বললেন, খুব ভাল করেছ।

বাবা বললেন, তোমার বাবা-মা ক'দিন এখানে থাকবেন বা তাঁদের কি প্রোগ্রাম, তা কি জানো?

—না, মেসোমশাই, সেসব কিছুই টেলিগ্রামে লেখেননি। তবে মাস খানেক আগে মা লিখেছিলেন, সিমলায় একটা সেমিনারে পার্টিসিপেট করার জন্য বাবাকে ইনভাইট করেছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাবা বোধহয় ঐ সেমিনারের জন্যই সিমলায় যাতায়াতের পথে ক'দিন এখানে থাকবেন।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, তা হতে পারে।

মা বললেন, সার্থক, তোমার বাবা-মা যেন আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই চলে না যান।

—না, না, মাসিমা, তা হবে না।

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাল স্টেশনে যাবে তো?

—না, মাসিমা, আমার পক্ষে স্টেশনে যাওয়া সম্ভব হবে না। মাসি-মেসোমশাই স্টেশনে যাবেন।

সার্থক একটু থেমে বলে, কাল সন্ধের পর আমি মাসির ওখানে যাবো। তার আগে আমি কিছুতেই ক্যাম্পাস থেকে বেরুতে পারবো না।

চা-টা খেয়েই সার্থক চলে যায়।

পরের দিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পর মা কথায় কথায় বললেন, সার্থকের বাবা-মা কালই সিমলা যাচ্ছেন। ওখান থেকে ফিরে এসে ওরা পুরো এক সপ্তাহ দিল্লীতে থাকবেন। তখন ওরা একদিন আমাদের এখানে আসবেন।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, খুব ভাল কথা কিন্তু আমার বিয়ের ব্যাপারে ওদের কাছে কিছু বলবে না।

—যদি সার্থকের বিয়ে ঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে তো...

মাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললাম, না, তাহলেও বলবে না।

—কেন? সার্থককে কি তোর ভাল লাগে না?

—অত কোয়ালিফায়েড ছেলে আমার দরকার নেই।

—কেন? লেখাপড়ায় ভাল হওয়া কি অন্যায়?

—অন্যায় কেন হবে?

আমি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, আই-এ-এস আই-পি-এস দের মত এম. বি. এ বা আই-আই-টি থেকে পাশ করা ছেলেরা বড্ড অহংকারী হয়।

মা তবু বলেন, কিন্তু সার্থাকে তো কখনই অহংকারী মনে হয়নি।

—আমাদের কাছে অহংকার দেখাবে কেন? আমরা কি তার কৃপাপ্রার্থী?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই বড্ড বাজে কথা বলিস।

যাইহোক দিন দশেক পর এক রবিবার দুপুরে মাসিমা-মেসোমশায়ের সঙ্গে সার্থক আর ওর বাবা-মা আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলেন।

আমি ওদের প্রণাম করতেই সার্থকের মা এক গাল হাসি হেসে বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, শুধু তোমার সঙ্গে আলাপ করার লোভেই এত বছর পর আমরা দিল্লী এলাম।

কথাটা শুনে ভাল লাগলেও একটু খটকা লাগল। একটু চাপা হাসি হেসে বললাম, না, না, মাসিমা, তা বলবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সার্থকের বাবা আমাকে বললেন, দেখো মা, আমার স্ত্রী মিথ্যা বলেননি। শুধু তোমার সঙ্গে একটু ভালভাবে আলাপ-পরিচয় করার জন্যই আমি সিমলার সেমিনারে যেতে রাজি হই।

মাসিমা একটু হেসে বললেন, কী জামাইবাবু, অর্পিতাকে কেমন দেখছেন?

—দেখছি ঠিক আমার মায়ের মতন।

এবার উনি মুখ ঘুরিয়ে মাসিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে পিকনিকের যে ছবিগুলো পাঠিয়েছিলে তার থেকে আমার মা জননীকে দেখতে অনেক ভাল।

সার্থকের মা বললেন, ঠিক বলেছ।

ওদের কথাবার্তা শুনে আমার বাবা-মা তো আনন্দে খুশিতে ভরে গেলেও আমি লজ্জায় মরে যাই। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, ওরা আমাকে পুত্রবধূ করার মানসিক প্রস্তুতি

নিয়েই আমাদের বাড়ি এসেছেন। সেদিন ওদের কথাবার্তায় জানতে পারলাম, শুধু মাসিমা আর সাহানা না, সার্থকের মতামত জানার পরই ওরা আমার ব্যাপারে এত উৎসাহী হয়েছেন।

সেদিন খেতে বসে সার্থকের বাবা আমাকে বললেন, দেখো মা জননী, আমি সারাজীবন অধ্যাপনা করে ছাত্রদের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছি। এখন আর কারুর উপর ছড়ি ঘোরাতে ইচ্ছে করে না। আমি চাই, তুমি এখন আমার উপর ছড়ি ঘোরাও।

মা'র কথামতো আমিই পরিবেশন করছিলাম। সার্থকের মা'কে বললাম, মাসিমা, আপনাকে আর একটা ফিস ফ্রাই দিই?

উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, যদি বলো, 'মা, তোমাকে একটা ফিস ফ্রাই দিই, তাহলে নিশ্চয়ই নেবো।

আমি লজ্জায় দ্বিধায় মরে গেলেও কোনমতে বললাম, মা, একটা ফিস ফ্রাই দিই?

উনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, হ্যাঁ, মা, নিশ্চয়ই দেবে।

সার্থকের বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মা জননী যদি আমাকে বাবা বলে ডাকে, তাহলে আমিও আর একটা ফিস ফ্রাই নিতাম।

ওর কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি।

সত্যি কথা বলতে কি, এভাবে যে আমার বিয়ে ঠিক হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। শুধু আমি কেন, আমার মা-বাবাও ভাবতে পারেননি।

আমার বিয়ের ব্যাপারে কোনদিনই মা-বাবাকে ঠিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিনি। তবে হ্যাঁ, আমি বি. এ পাস করে এম. এ পড়তে শুরু করার পরই মা মাঝে-মধ্যেই আমার বিয়ের ব্যাপারে একটু উদ্যোগী হতে বলতেন কিন্তু বাবা সব সময়ই বলতেন, মেয়েকে এম. এ পাস না করিয়ে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না।

কদাচিৎ কখনও মা একটু বেশি কিছু বললেই বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বলতেন, ভুলে যেও না, আমি তিন-তিনটে বোন আর দুটো ভাগ্নীর বিয়ে দিয়েছি। ভালভাবে লেখাপড়া না শিখিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিলে যে ভবিষ্যতে তারা যে কত বিপদে, কত সমস্যায় পড়তে পারে, তা আমি খুব ভাল করেই জানি।

বাবা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, এই সেদিনও তো তুমি দেখলে, আমি হাজার বার বারণ করা সত্ত্বেও শীলা আর দিলীপ জোর করে রেখার বিয়ে দিয়ে মেয়েটার কি সর্বনাশ করল।

মা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সবই জানি।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বাবাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমি চাই না, আমার মেয়ে ঐরকম বিপদে পড়ুক।

আমার বিয়ের ব্যাপারে বাবার এই সতর্কতার কারণ ছিল। আমার দাদু স্কুল মাস্টার ছিলেন কিন্তু স্কুলের সামান্য মাইনেতে সংসার চালানো সম্ভব ছিল না বলে সকাল-সন্ধের ছাত্র পড়াতেন। একদিন রাত্রে ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে লরির ধাক্কায় দাদু মারা যান। তখন বাবার বয়স মাত্র একুশ ও এম. এস-সি পড়ছেন। বড়পিসি সেবারই ম্যাট্রিক পাস করে ভিক্টোরিয়াতে আই. এ পড়ছে। তখন মেজ পিসি ক্লাস সেভেন'এ আর ন'বছরের ছোট পিসি ক্লাস ফোর'এ পড়ছে। সঞ্চয় বলতে পোস্ট অফিসের পাস বইতে মাত্র শ' পাঁচেক টাকা আর ঠাকুমার সামান্য কিছু গহনা।

সেই দুর্দিনে বাবা পড়াশুনা ছেড়ে সায়েন্স কলেজের এক অধ্যাপকের সুপারিশে এক'শ পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে বেঙ্গল কেমিক্যালে ট্রেনি ল্যাবরেটরি অ্যাসিসট্যান্টের কাজ পেলেন কিন্তু ঐ টাকায় পাঁচজনের সংসার চলে না বলে দু'তিনজন ছাত্র পড়িয়ে শতখানেক টাকা অতিরিক্ত আয় করতেন।

এইভাবে বছর দুই চলার পর এক ছাত্রের বাবার সুপারিশে আমেদাবাদের একটা টেক্সটাইল মিলে সাড়ে চারশ'টাকা মাইনের সেলস্ রিপ্রেসেন্টেটিভ' এর চাকরি নিয়ে বাবা বিলাসপুর চলে গেলেন। তিন পিসিকে নিয়ে ঠাকুমা কলকাতাতেই থেকে গেলেন। বাবা মাইনের পুরো টাকাটাই ঠাকুমাকে পাঠিয়ে দিতেন ; ট্রাভেলিং আর ডেলি অ্যালাউন্সের টাকা দিয়ে কোনমতে নিজের খরচ চালাতেন।

ওখানে যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই ঠাকুমা বাবাকে লিখলেন—প্রাণাধিক খোকা, গতকাল আই. এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মীনু ফেল করেছে। তুই এখানে থেকে যাবার পর থেকেই হালদার বাড়ির দেবুর সঙ্গে ওর মেলামেশা খুবই বেড়ে যায় এবং সারাদিনে দু'এক ঘণ্টাও পড়াশুনা করতো না। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। দেবু আর মীনুর হাবভাব আমার বিশেষ ভাল লাগছে না। তাই তুই যদি একবার দু'চার দিনের জন্য এখানে আসতে পারিস, তাহলে খুব ভাল হয়। আমি জানি, বিলাসপুর থেকে আসা-যাওয়া যথেষ্ট খরচের এবং তোর কষ্ট হবে কিন্তু তবুও তোকে আসতে বলতে বাধ্য হচ্ছি।...

হ্যাঁ, ঐ চিঠি পেয়েই বাবা কলকাতা গিয়েছিলেন। বাবা বড়পিসিকে বলেছিলেন, হ্যাঁরে মীনু, তুই তো বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল ছিলি। এবার হঠাৎ ফেল করলি কী

করে?

বড়পিসি চুপ করে থাকলেও বাবা বলে যান, তুই তো জানিস সংসারের অবস্থা। তুই বি. এ পাস করে কোন একটা স্কুলে চাকরি-বাকরি নিলে আমাদের দু'জনের আয় দিয়ে সংসারের চেহারাটাই বদলে দিতাম।

বাবা আবার বলেন, তারপর আমার কিছু আয় বাড়লেই একটা ভাল ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতাম।

বড়পিসি মুখ নিচু করে বলেছিলেন, আমি আর পড়াশুনা করব না।

—কেন?

—আমার আর পড়াশুনা করতে ভাল লাগছে না।

—পড়াশুনা না করে শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকবি?

—তুমি আমার বিয়ে দিয়ে দাও।

বাবা অবাক হয়ে বলেন, বিয়ে? গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই তোর বিয়ে দেব?

—বললাম তো, আমি আর পড়াশুনা করব না।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বাবা বলেন, তুই কি সংসারের অবস্থা জানিস না? এখন কী করে তোর বিয়ে দেব?

বড়পিসি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে, আমার বিয়েতে তোমার কোন খরচ করতে হবে না। দেবুদা বলেছে, কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করবে।

বাবা অবাক হয়ে বলেন, হালদারবাড়ির ঐ অপদার্থ ছেলেটাকে তুই বিয়ে করবি?

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। সব কিছুই ঠাকুমার কাছে শোনা। উনি আমাকে বলেছিলেন, খোকা হাজার বার ওকে বারণ করেছিল কিন্তু মীনুর মাথায় তখন ভূত চেপেছে। ও দেবুকেই বিয়ে করল।

—তারপর?

—তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তোর বড়দি হলো। তার ঠিক দু'বছর পর তোর মেজদি আর এর তিন বছর পর তোর বড়দা হলো।

—তখন পিসেমশাই কী করতেন?

—ঘোড়ার ডিম করতো।

ঠাকুমা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আদ্যিকালের তিন-চারটে ভাড়াটেদের কাছ থেকে যা পেতো,তাই দিয়ে কোনমতে সংসার চালাতো আর দিনরাত আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতো।

আমি প্রশ্ন করি, তোমরা কিছু বলতে না?

—বলব কী? ওরা কি তখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো?

—একেবারেই আসা-যাওয়া ছিল না?

—না।

ঠাকুমা একটু থেমে বলেন, তবে তোর অন্য দুই পিসি মাঝে-মধ্যেই ওদের ওখানে যেতো। ওদের কাছ থেকেই একদিন শুনলাম, তোর বড়দির টাইফায়েড হয়েছে কিন্তু টাকাকড়ির অভাবে ঠিকমত চিকিৎসা করাতে পারছে না।

—ইস!

ঠাকুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ভাগ্যক্রমে খোকা তখন ছুটিতে কলকাতা এসেছিল। ঐ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে খোকা আমাকে নিয়ে ওদের বাড়ি গেল।

—তারপর?

—তারপর আর কি?

ঠাকুমা একটু হেসে বলেন, আমি দিনরাত্তির মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে থাকতাম আর তোর বাবা ডাক্তার-ওষুধপথ্যের সব ব্যবস্থা করতো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, ঐ অসুখ সেরে যাবার পর পরই তো তোর বাবার কথামতো তোর বড়দিকে আমি নিয়ে এলাম।

—বড়পিসি-পিসেমশাই আপত্তি করলেন না?

—ওরা কী বলবে? ঐ মাসখানেকের মধ্যে মেয়েটা আমার আর খোকার এমন ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল যে..

আমি হাসতে হাসতে বলি, বাবা আমার চাইতে হাজার গুণ বেশি ভালবাসেন বড়দিকে।

—ওরা দু'জনেই দু'জনকে পাগলের মত ভালবাসে।

ঠাকুমার গলা জড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর আমি জিজ্ঞেস করি, বড়দির ঐ অসুখের সময়ই কি তোমাদের সঙ্গে বড়পিসিমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হলো?

—দ্যাখ ময়না, অল্প বয়সে অনেক মানুষই মোহের ঘোরে এমন কিছু কাজ করে যার জন্য পরবর্তীকালে অনুশোচনা করতে বাধ্য। ঐ মেয়েটার অসুখের সময়ই ওরা দু'জনে বুঝেছিল, খোকার কথা না শুনে ওদের বিয়ে করা খুব অন্যায় হয়েছিল।

উনি না থেমেই বলেন, তোর বড়দিকে বাঁচাবার জন্য খোকার কাণ্ডকারখানা দেখে ওরা দু'জনেই ওর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল। ওদের কান্নাকাটি দেখে খোকাও ওদের দু'জনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ব্যাপারে তোমরা কোনদিন কোন ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

আমি একটু হেসে বলি, যাই বল ঠাকুমা, বড়পিসি আর পিসেমশাইকে আমার খুব ভাল লাগে।

ঠাকুমা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ, ওরা বদলে গেছে ঠিকই কিন্তু বিশেষ লেখাপড়া না শেখার জন্য কোনদিনই তো ভাল চাকরি-বাকরি পায়নি। তাইতো বড্ড দুঃখে-কষ্টে সংসার চালাতে হয়।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোর বাবা মাসে মাসে ওদের টাকা না পাঠালে হয়তো ওদের দু'বেলা খাওয়াও জুটতো না।

মেজপিসি বি. এ পাস করার পর বিয়ে হয় সিউড়ির এক উকিলের সঙ্গে। মেজপিসির শ্বশুরও বিখ্যাত উকিল ছিলেন। ওর প্রথম পাঁচটি সন্তা-ই মেয়ে এবং তারপর মেজ পিসেমশাই। তাই তো এই ছেলের প্রতি ওদের দুর্বলতার সীমা ছিল না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মাত্র ছেলের সঙ্গে মেজপিসির বিয়ে দেওয়ায় ঠাকুমা আর বাবা খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং মেজপিসিকে দেখে সব সময়ই ওদের মনে হয়েছে, সে বেশ সুখেই আছে।

ঠিক দু'বছর পর বিবাহ বার্ষিকীর দিনই মেজপিসি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার পর জানা যায়, ওর স্বামী চরিত্রহীন ছিলেন এবং বর্ধমান শহরে তার আরো একটি সংসার আছে। মেজপিসি আত্মহত্যা করার দিনই ঠাকুমাকে যে চিঠি লিখে নিজের হাতে ডাক বাক্সে ফেলেন, তাতে উনি স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন, স্বামী ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়িও আমার প্রতি ন্যায় বিচার করেননি। ওঁরা যে শুধু ছেলের অবৈধ সংসারের কথা লুকিয়েই আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তা নয়। আমার শ্বশুর মশাই তোমার জামাইয়ের বর্ধমানের রক্ষিতার বাড়িতে নিয়মিত জমির ধান-চাল ছাড়াও টাকা পাঠান। সুতরাং কাকে নিয়ে কার ভরসায় এই সংসারে থাকব বলতে পারো?

মেজপিসি আত্মহত্যা করার ঠিক তিন মাস পরই ঠাকুমা মারা যান।

ছোটপিসিকে যে বাবা কী ভালবাসেন, তা ভাবা যায় না। বাবা তো এখনও বলেন, শীলা আমার হৃদপিণ্ড, চোখের মণি। ও আমার একটা নিটোল স্বপ্ন। মেজপিসি মারা যাবার পর ছোটপিসির প্রতি বাবার স্নেহ, দুর্বলতা আরো হাজার গুণ বেড়ে গেল। তাইতো ছোটপিসি বি. এ পাস করার পর অনেক খোঁজখবর নেবার পরই তার বিয়ে দেন। ছোট পিসেমশাই শুধু যে কলেজের লেকচারার, তা নয়। ওঁর মত ভদ্র সভ্য আদর্শবান মানুষ সত্যি দুর্লভ।

ছোটপিসি কোনদিন কিছু না বললেও ছোট পিসেমশাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রত্যেক মাসে বড়পিসির ওখানে যান। দু'এক ঘণ্টা গল্পগুজব করে চলে আসার আগে উনি বড়পিসির হাতে দু' একশ' টাকা গুঁজে দেবেনই। বড়পিসি বাধা দিলেই উনি একটু হেসে বলেন, বড়দি, আমি কি আপনার ছোট ভাই না?

বড়পিসি বলেন, একশ' বার তুমি আমার ছোট ভাই কিন্তু...

বড়পিসিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, বড়দি, ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে তো কোন কিন্তু থাকতে পারে না।

—তা ঠিক কিন্তু প্রত্যেক মাসে এভাবে...

—বড়দি, শীলা আপনার কোলে চড়ে মানুষ হয়েছে। আপনাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নেই? আপনারা দুঃখে-কষ্টে থাকলে কি শীলা শান্তিতে থাকতে পারবে?

বড়পিসি আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, ঠিক দাদার মতই তোমাকে নিয়েও আমার গর্বের শেষ নেই। তোমার মত ছোট ভাইকে না বলার ক্ষমতা তো আমার নেই ভাই।

ছোট পিসেমশায়ের মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ যে কি করে নিজের মেয়ের ব্যাপারে এমন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা সত্যি ভাবা যায় না। এ যুগেও শুধু পারিবারিক ঐতিহ্য দেখেই কি কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়? ধনী ও বনেদী বাড়ির অধিকাংশ পুরুষই যে চরিত্রহীন বা মাতাল হয়, তা কি ছোট পিসেমশাই জানতেন না?

যাইহোক এইসব কারণেই আমার বিয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ও সতর্ক ছিলেন।

সার্থকের মা-বাবা কলকাতা চলে যাবার কয়েক দিন পরই বাবা আমাকে বললেন, দ্যাখ ময়না, তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস। তাই তোকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

আমি মা'র পাশে চুপ করে বসে থাকি।

বাবা বলেন, প্রথম দিন থেকেই সার্থককে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তোর মা'র খুবই ভাল লাগে। পরবর্তীকালে সার্থককে আমারও বেশ ভাল লাগে কিন্তু তবুও ওর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইনি।

উনি একটু থেমে আবার বলেন, শুধু সাহানার মা-বাবার কাছেই না, আই-আই-টি'র তিন-চারজন অধ্যাপক ছাড়াও হস্টেলের নানাজনের কাছে আমি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, সার্থক সত্যি ভাল ছেলে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এইসব জানার পরই আমি সার্থকের বাবা-মা'কে নেমন্তন্ন করি। ওরা তো তোকে পুত্রবধূ বলেই ধরে নিয়েছেন। তবু বলব, তুই নিজে ভাবনা-চিন্তা করে আমাদের জানাবি, এই বিয়েতে তোর মত আছে কি না। তোর সামান্যতম দ্বিধা থাকলে আমি কখনই এই বিয়ে দেব না।

পরে আমি মা'কে বললাম, মাসিমা-মোসোমশাই ঠিক সাহানার মতই আমাকে

ভালবাসেন। সার্থক বা তার মা-বাবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকলে ওরা কখনই এই বিয়ের ব্যাপারে এতটা উৎসাহী হতেন না।

মা বললেন, সে তো একশ' বার সত্যি।

—তবে ভবিষ্যতে আমার কপালে কি আছে, তা তোমরাও জানো না, আমিও জানি না।

—ভবিষ্যতের কথা আর কে বলতে পারে? কিন্তু তবু বলছি, তোর বাবার আর আমার স্থির বিশ্বাস, তুই সুখী হবি।

আজ এই নার্সিং হোমে শুয়ে শুয়ে পিয়াসাকে দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো, হ্যাঁ, সত্যি আমি সুখী হয়েছি।

বিদ্যা-বুদ্ধি খ্যাতি যশ বিষয়-সম্পত্তি মানুষকে সুখ দিতে পারে কিন্তু সুখী করতে পারে না, সামাজিক মর্যাদা দিতে পারে কিন্তু আপামর সাধারণের ভালবাসা দিতে পারে না ; শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে কিন্তু আনন্দ আত্মতৃপ্তি দিতে পারে না। এই সংসারে যে মুষ্টিমেয় মানুষ সুখী, পাঁচজনের ভালবাসায় ধন্য, আনন্দ-আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ, আমি তাদেরই একজন।

আমি মনে মনে পরমেশ্বরকে শত কোটি প্রণাম জানাই আর সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আমার এই সদ্যজাতা পিয়াসাও যেন সুখী হয়।

সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠি। পুবের আকাশে একটু আলো দেখা দিতে না দিতেই ঠাকুমা আমার মুখের উপর মুখ রেখে আদর করে ডাকতেন, ও দিদি, ওরে আদরিণী, উঠবি না? দ্যাখ, দ্যাখ, কত পাখি ডাকছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার ঘুম ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঠাকুমার কোলে শুয়ে পড়তাম। ঠাকুমা আমার মুখে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে আপন মনে গেয়ে উঠতেন—

শুধু তোমার বাণী নয় গো,
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে
তোমার পরশখানি দিয়ো।...

আরো দু'এক লাইন গেয়ে ঠাকুমা থেমে যেতেই আমি বলতাম, ব্যস! শেষ হয়ে

গেল? এত ছোট গান?

ঠাকুমা একটু হেসে বলতেন, নারে দিদি, শেষ হয়ে যায়নি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলতেন, আমি আর জানি না।

—কেন জানো না?

—আমি কি গান শিখেছি? নেহাত বাবা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে চাকরি করতেন বলে ওখানে কয়েক বছর পড়াশুনা করার জন্যই কিছু কিছু গানের দু'চার লাইন এখনো মনে আছে।

তখন না, একটু বড় হবার পর জেনেছি, ঠাকুমার বাবা শান্তিনিকেতনে রবি ঠাকুরের স্কুলে পড়াতেন। ঠাকুমা বছর পাঁচেক ওখানেই পড়াশুনা করেছেন। তারপর কালাজ্বরে ঠাকুমার মা মারা যাওয়ায় ওর বাবা ওখানকার চাকরি ছেড়ে শ্রীরামপুরে চলে যান।

আমি প্রশ্ন করি, তোমার মা মারা গেলেন বলেই তোমার বাবা ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিলেন?

ঠাকুমা উত্তর দেন, না ছেড়ে তো উপায় ছিল না।

—কেন?

—তখন আমার বয়স বারো, ছোট বোন ঠিক আট আর ভাই মাত্র সাড়ে চার বছরের।

উনি একটু থেমে বলেন, বাবার পক্ষে তো চাকরি-বাকরি করে সংসার সামলানো সম্ভব ছিল না। তাইতো উনি আমাদের তিন ভাই বোনকে নিয়ে বড় জ্যাঠামশায়ের ওখানে গেলেন।

আমি চুপ করে থাকি।

ঠাকুমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার জীবনের সব চাইতে আনন্দের দিনগুলো শান্তিনিকেতনেই কেটেছে। ওখানে না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না, ঈশ্বর এত ঐশ্বর্য আর আনন্দ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন।

উনি দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গেয়ে ওঠেন—

আকাশভরা সূর্য-তারা,
বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি
পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে
আমার গান।...

দু'এক মিনিট চোখ বন্ধ করে ঠাকুমা কি যেন ভাবেন। তারপর বলেন, দ্যাখ, শহরের মানুষ বি. এ-এম. এ বা ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেও সংসার বলতে বোঝে

বাবা-মা ভাইবোন-ছেলেমেয়ে। এর বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আমি ঠাকুমার কথা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না কিন্তু ওকে প্রশ্ন করতে পারি না। আমি অবাক হয়ে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকি।

ঠাকুমা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, গুরুদেবের কৃপায় আমরা শিখেছি, না, না, আমাদের সংসার এত ছোট না। এই আকাশ-বাতাস সূর্য-তারা নদীনালা গাছপালা পশু-পক্ষী নিয়ে যে বিশাল সংসার, আমরা সেই সংসারের বাসিন্দা।

উনি এক গাল হাসি হেসে বলেন, সত্যি করে ব' তো দিদি, এই ভোরবেলায় পাখির ডাক শুনলে মনে হয় না, ওরা আমাদের কত আপন, ওরা আমাদের কত ভালবাসে?

আমিও খুশির হাসি হেসে বলি, হ্যাঁ, ঠাকুমা, ঠিক বলেছ। পাখির ডাক শুনলেই মনে হয়, ছুটে ওদের কাছে চলে যাই।

এই নার্সিং হোমের পাশেই পার্ক। আমার কেবিনের দক্ষিণের জানলার ওপাশেই একটা বিশাল মেহগনি গাছ। এই গাছে যে কত শত শত পাখি থাকে, তা আমি জানি না। তবে রাতের অন্ধকারের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ওরা আলোর বন্দনায় মেতে ওঠে।

হ্যাঁ, ঐ শত সহস্র পাখির কলকাকলিতেই আমার ঘুম ভেঙে যায় আর বার বার শুধু ঠাকুমার কথা মনে হয়। এখন এই সময় ঠাকুমা আমার পাশে থাকলে বোধহয় গেয়ে উঠতেন—

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমার আমার দেখা হল
সেই মোহনার ধারে।...

আমি কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারি না। ঘুমন্ত পিয়াসাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জানলার সামনে দাঁড়াই। দু'চোখ ভরে দেখি, অন্ধকারের পাতলা ওড়না সরিয়ে সম্রাট আদিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরছেন। ঠাকুমা ঠিকই বলতেন, দ্যাখ দিদি, এই সাত সকালে শুধু কয়েকটি মুহূর্ত ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন।

আমি পিয়াসাকে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে খুব চাপা গলায় বলি, তুমি একটু বড় হলে আমিও তোমাকে এই সময় গেয়ে শোনাবো—দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে...

হঠাৎ সিস্টার পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি গান থামিয়ে হেসে ফেলি।

সিস্টার একটু হেসে বলেন, মেয়েকে গান শোনাচ্ছিলেন?

—আমার ঠাকুমা এইরকম ভোরবেলায় আমাকে কোলে নিয়ে রোজ গান শোনাতেন তো. তাই...

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, নাইট ডিউটি দিতে সত্যি বড় কষ্ট হয় কিন্তু ভোরবেলায় ডিউটি রুমের জানলায় দাঁড়িয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে আর হাজার হাজার পাখির ডাক শুনে যেন সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, ভাই, ঠিক বলেছেন।

আমার নর্ম্যাল ডেলিভারি হলেও দু'তিনটে স্টিচ করতে হয়েছে। তাই তো আমাকে সাত-আট দিন এই নার্সিং হোমে থাকতেই হবে। শুধু সার্থক না, আমার শ্বশুর-শাশুড়িও আমাকে আর পিয়াসাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। আগামী কাল রাজধানী এক্সপ্রেসে আমার বাবা-মা দিল্লী থেকে এখানে এসে পৌঁছবেন। তাঁরাও যে নাতনীকে প্রাণভরে আদর করার জন্য ছটফট করবেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আমিও বাড়ি ফেরার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেখতে চাই, পিয়াসা আর আমাকে নিযে সার্থক কি পাগলামি করে।

তবু বলব, নার্সিং হোমে থাকতে আমার খারাপ লাগছে না। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে থাকতে আমার বেশ ভালই লাগছে। মর্নিং আর আফটার-নুন শিফট্ এর সিস্টাররা কখনও আমার জন্য, কখনও পিয়াসার জন্য হরদম আমার এই কেবিনে আসা-যাওয়া করলেও আমার খেয়াল-খুশি মত ভাবনাচিন্তা বা মেয়েকে আদর করার যে অফুরন্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ এখানে পাচ্ছি, তা বাড়িতে পাওয়া সম্ভব নয়। সংসারের প্রিয়জনদের খুশি করার জন্য আমাদের সবাইকে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা স্বকীয়তা হারাতে না হলেও অন্তত আংশিকভাবে অপূর্ণ রাখতেই হয়।

মাঝে-মাঝেই পিয়াসাকে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যাই। অবাক হয়ে ভাবি, এই মেয়েটা আমারই গর্ভে সৃষ্টি হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, শুধু মানুষ কেন, সব জীবজন্তুই তো মাতৃগর্ভে জন্ম নেয় কিন্তু সবাই কেন মা হতে পারে না?

আবার কখনও পিয়াসার চোখ-মুখ-কান দেখতে দেখতে, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবি, কোন মহাশক্তিমান শিল্পী এত নিঁখুতভাবে ওকে আমার গর্ভের মধ্যে সৃষ্টি করলেন? কে? কে এই শিল্পী? কে এই স্রষ্টা? তিনি কি ভগবান?

জানি না।

তবে জানি, শুধু স্বামী-স্ত্রীর মিলনেই সব সময় সন্তান হয় না। কোন এক অদৃশ্য কারিগর কলকাঠি না নাড়লে বোধহয় মা হওয়া যায় না। পিয়াসাকে আমার বুকের দুধ

খাওয়াতে খাওয়াতে সেই মহাশক্তিমান অদৃশ্য কারিগরকে মনে মনে শত সহস্র কোটি প্রণাম জানাই।

শুধু পিয়াসাকে না, আমি নিজেকে দেখেও বিস্মিত হই। সিস্টাররা না থাকলে আমি কখনও কখনও অবাক হয়ে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকি। ক'দিন আগে পর্যন্ত যা ছিল পূর্ণ যৌবনের প্রতীক, দেহ সৌন্দর্যের অন্যতম আকর্ষণ, আজ তা আমাব সন্তানের জীবনধারণের একমাত্র উপকরণ। যে যাদুকর নিঃশব্দে আমার দেহে এই বিপ্লব ঘটালেন, তাঁকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো, তাও আমি জানি না।

নার্সিং হোমের এই কেবিনে শুয়ে বসে এইভাবে নিজের কথা ভাবতেও বেশ ভাল লাগছে।

মর্নিং আর আফটার নুন শিফট্'এ যে দু'জন সিস্টার থাকেন, তারা আমাদের পাশাপাশি চারটে কেবিনের দেখাশুনা করেন। চারটি কেবিনের মধ্যে তিনটেতেই ডেলিভারি কেস। অন্য একটি কেবিনে একটা অল্পবয়সী মেয়ে গতকালই ভর্তি হয়েছে। বেচারী কলেজের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বেশ চোট পেয়েছে। ডান পায়ের একটা ফ্রাকচার ছাড়াও পেটে বেশ চোট লেগেছে। তবে বোধহয় সিরিয়াস না কিন্তু তবু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

পিয়াসা হবার পর দু'দিন এই কেবিনের মধ্যেই বন্দিনী ছিলাম। তার পরদিন থেকেই একটু-আধটু পাশের কেবিনগুলোতে যাচ্ছি গল্পগুজব করার জন্য। আমার ঠিক পাশের কেবিনে মিসেস সরকার আছেন। পিয়াসা হবার দিনই মাঝ রাত্তিরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সন্তান হয়েছে। ভদ্রমহিলার বয়স বেশি না। বড় জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। উনি নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, জানেন, আমার বড় ছেলের বয়স কত?

—কত?

—সতের পূর্ণ হয়ে এই আঠারোয় পড়েছে।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ ভাই, আর বলবেন না লজ্জার কথা।

উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, বাচ্চা না হলে আমার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

আমি অবাক হয়ে বলি, বাচ্চা না হলে ক্যান্সার হবে কেন?

মিসেস সরকার একটু থেমে বলেন, আমি যখন ক্লাস টেন'এ পড়ি, তখনই আমার বিয়ে হয় আর ঠিক দেড় বছর পর আমার ছেলে হয়।

—তখন আপনার বয়স কত?

—ঠিক আঠারো।

—তারপর আর কোন বাচ্চা হয় নি?

উনি একটু হেসে বলেন, আমরা বাচ্চা হতে দিইনি।

আমিও একটু হেসে বলি, আজকাল তো বারো আনা শিক্ষিত মানুষই অনেক হিসেব-নিকেশ করে মা-বাবা হয়।

—বেশি হিসেব করতে গিয়েই তো আমার সর্বনাশ হচ্ছিল।

—সর্বনাশ হচ্ছিল মানে?

মিসেস সরকার একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, বছর চারেক আগে হঠাৎ দেখলাম, মাঝে মাঝেই আমার ব্রেস্টে ব্যথা হচ্ছে কিন্তু ভেবেছি, ব্রা পরে শুয়েছি-টুয়েছি বলে ব্যথা হচ্ছে। তাই বিশেষ গ্রাহ্য করিনি।

আমি প্রায় অবাক হয়ে ওঁর কথা শুনি।

—বছরখানেক এইরকম চলার পর দেখলাম, প্রায় সব সময়ই আমার ব্রেস্টে ব্যথা কিন্তু তবু আমি কাউকে কিছু বলিনি।

—তারপর?

উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বছর দেড়েক আগে দেখলাম, ব্রা পরা তো দূরের কথা, ব্লাউজ পরলেও ব্যথা লাগছে।

—কি কাণ্ড বলুন তো!

—তখন আমি আমার স্বামীকে না বলে পারলাম না।

—তারপর ডাক্তার দেখালেন?

মিসেস সরকার একটু থেমে বলেন, তিন-চারজন বড় বড় ডাক্তারই বললেন, যখন ছেলেমেয়ে হবার সব চাইতে উপযুক্ত বয়স, তখন আমরা সন্তান হতে দিইনি বলেই ব্রেস্টে ব্যথা হচ্ছে। আর এই ধরনের ব্যথা থেকেই ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে।

—মাই গড!

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করি, তারপর বুঝি ট্রিটমেন্ট শুরু হলো?

উনি চাপা হাসি হাসতে বললেন, কোন ডাক্তারই আমাকে একটা ট্যাবলেটও খেতে দিলেন না। ওরা সবাই বললেন, চটপট প্রেগন্যান্ট হবার ব্যবস্থা করুন।

উনি হাসতে হাসতে কথাটা বললেও আমি বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করি, এখনও কি আপনার ব্রেস্টে ব্যথা হয়?

এবারও মিসেস সরকার হাসতে হাসতে বলেন, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এই বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকেই আমার আর ব্যথা হয় না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আসল কথা কি জানেন ভাই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেই অঘটন ঘটতে বাধ্য।

মিসেস সরকারের পাশের কেবিনে যে ভদ্রমহিলা আছেন, তার নাম অলকা কেজরিওয়াল। আমাদের পাশাপাশি চারটি কেবিনের শুধু ওঁর ভিজিটার্স সব চাইতে কম। কোনদিনই দু' তিনজনের বেশি আত্মীয়-স্বজন অলকা বা ওর মেয়েকে দেখতে আসেন না। প্রথম দু'একদিন ভেবেছি, উনি বোধহয় বাইরে থেকে এসে এখানে ভর্তি হয়েছেন। আলাপ হবার পর জানলাম, ওর শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি এই কলকাতাতেই।

অলকা নিজেই আমাকে বলেছিল, বাপের বাড়ির লোকজন বলতে শুধু আমার এক ভাই এখানে থাকে।

—আপনার বাবা-মা?

—ওঁরা দু'জনেই মারা গিয়েছেন।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার দিদি আর ছোটভাই দিল্লীতে থাকে।

এবার আমি প্রশ্ন করি, শ্বশুরবাড়ির সবাই তো এখানে থাকেন?

—হ্যাঁ।

অলকা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, পর পর দুটো মেয়ে হলো বলে শ্বশুরবাড়ির সবাই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

আমি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, মেয়ে হয়েছে বলে আপনার উপর অসন্তুষ্ট?

—হ্যাঁ, আমার উপর অসন্তুষ্ট।

—ওরা কি ভাবেন, আপনি ইচ্ছা করলেই ছেলে হতো? ছেলে-মেয়ে হওয়া কি আপনার-আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে?

অলকা আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হেসেই বলেন, আপনি ভাবতে পারবেন না, আমাদের মাড়োয়ারী সমাজ কত যুগ পিছিয়ে আছে। আমার তিন ননদের বিয়েতে শ্বশুরমশাই যে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ খরচ করেছেন, ছেলের বিয়ে দেবার সময় তার বারো আনাই আমার বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়েছেন।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলছি।

আমি মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকার পর বলি, আপনার স্বামী তো এই যুগের ছেলে ; নিশ্চয়ই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছেন। তবুও...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, আমার স্বামী চার্টার্ড

একাউন্টটেন্ট। ক্লায়েন্টের পার্টিতে ড্রিঙ্ক করেন, মুরগি খান। হরদম হিল্লী-দিল্লী যান প্লেনে, থাকেন ফাইভ স্টার হোটেলে কিন্তু বাড়িতে তিনি ষোল আনা ভেজিটেরিয়ান আর মা-বাবার একান্ত অনুগত পুত্র।

—কিন্তু তাই বলে...

উনি মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলেন, আমাদের সমাজের ছেলেরা যতই লেখাপড়া শিখুক, বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে পঁচিশ-তিরিশ-চল্লিশ লাখ না পেলে তাদের বুঝি মানমর্যাদাই থাকে না।

অলকা প্রায় না থেমেই বলেন, নিছক সম্পত্তির লোভে, টাকার লোভে আমাদের সমাজের ছেলেরা কখনই মা-বাবার অবাধ্য হয় না, হতে পারে না।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, আপনার স্বামী রোজ আপনাকে আর মেয়েকে দেখতে আসেন?

—হ্যাঁ, উনি রোজই আসেন।

—শ্বশুর-শাশুড়ি আসেন?

—শাশুড়ি একদিন এসেছিলেন কিন্তু শ্বশুর এখনও পর্যন্ত আসেননি।

—ননদরা আসেন?

—আমার মেজ ননদ আর তার স্বামী প্রত্যেক দিন আসেন কিন্তু অন্য দু'জন আসেনি।

আবার একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার পর শ্বশুর-শাশুড়ি খারাপ ব্যবহার করবেন না তো?

অলকা একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, না, না, তা করবেন না ; তবে ছেলের মা হতে পারলাম না বলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার নিন্দার বন্যা বয়ে যাবে।

ওর কথা শুনে দুঃখ পাই, কষ্ট হয় কিন্তু কি বলব, তা ভেবে পাই না। দু'চার মিনিট চুপ করে থাকার পর প্রশ্ন করি, আপনার বড় মেয়েকে বাড়ির সবাই ভালবাসেন?

—না, না, সেদিকে বিন্দুমাত্র কোন ত্রুটি নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি তো নাতনী বলতে অজ্ঞান।

—আর আপনার স্বামী?

উনি একটু হেসে বলেন, ওর ধারণা আমাদের মেয়ের মত সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ে পৃথিবীতে আর একটি আছে কি না সন্দেহ।

—যাক সেদিক দিয়ে আপনার কোন দুঃখ নেই।

—না, তা নেই কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারুর ছেলে হবার খবর শুনলেই শাশুড়ি যেভাবে আমাকে অপমান করেন, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

অলকা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, নিজে তিন-তিনটি মেয়ের মা হয়েও উনি কেন যে আমাকে এভাবে অপমান করেন, তা ভেবে পাই না।

আমি উঠে দাঁড়িয়েই একটু চাপা হাসি হেসে বলি, আপনি জানেন না, মেয়েরাই মেয়েদের সব চাইতে বড় শত্রু?

একেবারে শেষের দিকের কেবিনে আছে শ্রীরূপা। ও যেদিন এই নার্সিং হোমে ভর্তি হয়, সেদিন সন্ধের পর আমি আর অলকা কয়েক মিনিটের জন্য ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন ওর পা প্লাস্টার করা হলেও পেটের ব্যথায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। আমরা থাকতে থাকতেই সিস্টার এসে ওকে কামপোজ ইনজেকশন দিতেই ও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে আর রাত্তিরের দিকে আমি রোজই একবার ওর কেবিনে গিয়েছি। মামুলী দু'চারটে কথা বলেই চলে এসেছি কিন্তু গতকাল দুপুরে পিয়াসাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পর ওর কেবিনে যেতেই ও এক গাল হাসি হেসে বলল, আসুন, মাসিমা! শুয়ে শুয়ে আপনার কথাই ভাবছিলাম।

আমি একটু অবাক হয়ে একটু হেসে বলি, হঠাৎ আমার কথা ভাবছিলে কেন?

আমার চোখের পর চোখ রেখে শ্রীরূপা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, আপনাকে একটু দেখলেই যেন আমার কষ্ট অর্ধেক কমে যায়।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মাসিমা, সত্যিই বলছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আপনার এমন একটা মাধুর্য আছে, যা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তাছাড়া আপনাকে দেখলেই মনে হয়, আপনি মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারেন।

আমি আবার হাসতে হাসতে বলি, আমার যে এত গুণ আছে, তা তো জানতাম না।

—মাসিমা, আপনি যদি সত্যি সত্যি খুব ভাল না হতেন, তাহলে কি আপনার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ি আপনাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতেন?

—কে বলল, ওরা আমাকে নিয়ে মাতামাতি করেন?

—সব সিস্টাররাই তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওরা যখনই আসেন, তখনই শুধু আপনার গল্প করেন।

শ্রীরূপা একটু থেমেই জিজ্ঞেস করে, পিয়াসা কি ঘুমুচ্ছে?

—ওকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েই তো তোমার কাছে এলাম।

—তাহলে আপনাকে আমি সহজে ছাড়ছি না।

এবার জিজ্ঞেস করি, শ্রীরূপা, তোমরা কোথায় থাকো?

—বারাসাতে।

—তুমি ওখানকার কলেজই পড়ো?

—না, মাসিমা, আমি কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ি।

—তাহলে তো তোমাকে বেশ কষ্ট করেই কলেজে আসা-যাওয়া করতে হয়।

ও একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, তা একটু কষ্ট করতে হয় ঠিকই কিন্তু আমরা এক দল ছেলেমেয়ে একসঙ্গে আসা-যাওয়া করি বলে সময়টা ভালই কেটে যায়।

শ্রীরূপা মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে বলে, সত্যি কথা বলতে কি, যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকি, ততক্ষণই ভাল থাকি। বাড়িতে থাকতে আমার একদম ভাল লাগে না।

অন্যদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল না থাকলেও হঠাৎ জিভ ফসকে বেরিয়ে গেল, কেন?

শ্রীরূপা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল, আমার বাবার মত লোভী, অহংকারী, বদমেজাজী, চরিত্রহীন লোক আর আছে কি না জানি না।

ওর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। খুব সহজ সরলভাবে প্রশ্ন করি, তোমার বাবা কি করেন?

—ল'ইয়ার ; ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার।

ও একটু থেমে বলে, মা আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে বারাসাতে থাকলেও বাবা বসিরহাটে থেকে ওখানেই প্রাকটিশ করেন। পনের বিশ দিন অন্তর একবার বারাসাত ঘুরে যান।

আমি চুপ করে থাকলেও শ্রীরূপা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে যায়, আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, বসিরহাট সাব-ডিভিশানে যত ডাকাতি-মার্ডার-রেপ-চোরাচালান হয়, তা বোধহয় আর কোথাও হয় না। ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হিসেবে খ্যাতি আছে বলে বাবা যে কিভাবে আয় করেন বা কিভাবে কত খারাপ কাজ করেন, তা ভাবতে পারবেন না।

আমি একটু হেসে বলি, যে উকিল মামলা জিততে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই বেশি টাকা নিতে পারেন কিন্তু খারাপ কাজ করার তো সুযোগ নেই।

—মাসিমা, মামলা লড়ার জন্য দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে নৌকায় করে বাবার কাছে দিনরাত্তির কত যে মেয়ে-পুরুষ আসে, তা ভাবতে পারবেনা না। আমাদের বাড়িতেই ওরা থাকে খায়।

—হ্যাঁ, মফঃস্বল শহরে অনেক উকিলদের বাড়িতেই মক্কেলদের থাকা-খাওয়ার

ব্যবস্থা থাকে।

শ্রীরূপা একটু চাপা হাসি হেসে বলল, মাসিমা গ্রামগঞ্জের যেসব গরিব মেয়েরা বিপদে পড়ে বাবার কাছে আসে, তারা হাজার হাজার টাকা না দিতে পারলে বাবা কি করেন জানেন?

আমি মুখে কিছু না বললেও শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই ও বলল, বাবা রাতের পর রাত তাদের উপভোগ করেন।

—কি বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, মাসিমা, ঠিকই বলছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বাবার এই জঘন্য স্বভাবের জন্যই তো মা কখনও আমাদের ভাইবোনকে নিয়ে বসিরহাট যেতে চান না।

একটা চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এই নার্সিং হোমে কে ভর্তি করলেন? তোমার বাবা?

—না, না, বাবা না ; আমার ছোটমামা আর মামি।

ও একটু হেসে বলল, এই ছোট মামা আর মামি আমার মাকে অসম্ভব ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। ওরা আমাদের তিন ভাইবোনকেও অসম্ভব স্নেহ করেন।

—তোমার বাবা-মা তোমাকে দেখতে আসেন?

—বাবা আসেন নি কিন্তু মা-ভাইবোনেরা দু'দিন এসেছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ওদের পক্ষে তো রোজ রোজ বারাসত থেকে আসা সম্ভব না।

—তোমার ছোটমামা-মামি রোজ আসেন?

—হ্যাঁ, ওঁরা প্রত্যেকদিন আসেন।

—তোমার ছোটমামা কি করেন?

—উনি হংকং ব্যাঙ্কের অফিসার।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, আর কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না?

শ্রীরূপা একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, মাসিমা, শৈবাল রোজ আসে।

ওর মুগ্ধ সলজ্জ হাসি দেখেই বুঝলাম, শৈবাল ওর মনের মানুষ। জিজ্ঞেস করলাম, শৈবাল কি তোমার সঙ্গে পড়ে?

—না, না, মাসিমা, ও আমার চাইতে বড়। যাদবপুরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছে। সামনের বছরই ফাইন্যাল দেবে।

—তার মানে লেখাপড়ায় খুবই ভাল।

—শুধু লেখাপড়ায় না, ওর স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মাসিমা, আমি শৈবালের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। ওকে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আমি একটু হেসে বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দিও। অমন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে আমিও খুশি হবো।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, শৈবালও কি বারাসতে থাকে?

—না, মাসিমা, ও সল্ট লেকে থাকে।

—তোমার সঙ্গে ওর আলাপ হলো কোথায়?

শ্রীরূপা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, বাবা কাজের অছিলায় আমাদের নিয়ে কখনই কোথাও বেড়াতে যান না ; তবে ছুটিছাটায় মা আমাদের নিয়ে কোথাও যেতে চাইলে বাবা টাকাকড়ি দিতে দ্বিধা করেন না। তাই তো মা আমাদের ভাইবোনকে নিয়ে বছরে অন্ত দু'বার বাইরে কোথাও নিয়ে যান।

ও একটু থেমে বলে, বছর তিনেক আগে মা আমাদের নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। তখন আমরা যে শেয়ারের ট্যাক্সিতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিলাম, শৈবালও সেই ট্যাক্সিতে দার্জিলিং যাচ্ছিল।

—তখনই তোমার সঙ্গে আলাপ হয়?

—না, মাসিমা, ট্যাক্সিতে যাবার সময় আমি ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি কিন্তু ঐ ক'ঘণ্টার মধ্যেই মা'র সঙ্গে ওর দারুণ ভাব জমে যায়।

শ্রীরূপা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, শৈবালকে মা'র দারুণ ভাল লেগে যায়। তারপর মা যখন শুনলেন, শৈবালের মাত্র তিন বছর বয়সের সময় ওর মা মারা যান, তখন মা ওকে বললেন, বাবা, তুমি যদি আমাকে মা বলে ডাকো, তাহলে খুব খুশি হবো।

আমি একটু হেসে বলি, শৈবাল কি বলল?

—মাসিমা, আপনি ভাবতে পারবেন না, মা'র কথা শুনে ও কি খুশি হয়েছিল।

ও এক গাল হাসি হেসে বলে, শৈবালের জন্য কি আনন্দেই যে দিনগুলো কেটেছিল, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

—শৈবালের আর কোন ভাইবোন আছে?

—হ্যাঁ, ওর এক দিদি আছে। এইতো দু'বছর হলো দিদির বিয়ে হয়েছে।

ও একটু হেসে বলল, দিদিও আমার মাকে মা বলেই ডাকে। বিয়ের পর জামাইবাবুও মাকে মা বলেন।

—বাঃ! খুব ভাল।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করি, শৈবালের বাবা কি করেন?

—উনি টাটা স্টিলের মার্কেটিং ডিরেক্টর।

—তার মানে উনি খুবই বড় পোস্টে আছেন।

শ্রীরূপা একটু হেসে বলে, মাসিমা, আমার বাবা যেমন অহংকারী, শৈবালের বাবা ঠিক তার বিপরীত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মাসিমা।

ও একটু থেমে বলে, মেসোমশাই অফিস যাবার সময় পুরোদস্তুর সাহেব। বছরে যে কতবার বিদেশ যাচ্ছেন, তার ঠিকঠিকানা নেই কিন্তু বাড়িতে তাঁকে দেখলে নিছক একজন সাদাসিধে বাঙালি মনে হবে।

—শ্রীরূপা, যাঁরা সত্যিকারের শিক্ষিত, তাঁরা সবসময় এইরকমই সহজ সরল আড়ম্বরহীন হন।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, তোমার বাবার সঙ্গে শৈবালের পরিচয় হয়েছে?

—হ্যাঁ, মাসিমা, হয়েছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, শৈবালকে বাবারও খুব ভাল লেগেছে।

জিজ্ঞেস করি, শৈবাল মাঝে-মধ্যে তোমাদের বাড়ি যায়?

—ও পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে ইচ্ছে থাকলেও ওর পক্ষে বারাসত আসা বিশেষ সম্ভব হয় না। তবে প্রত্যেক মাসেই এক-আধবার দু'এক ঘণ্টার জন্য এসে মাকে দেখে যায়।

—তুমি ওদের বাড়ি যাও?

—মেসোমশাই কলকাতায় থাকলে উনি প্রত্যেক রবিবার আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মাসিমা।

শ্রীরূপা একটু হেসে বলে, ওখানে গেলে যে কি আনন্দে আমাদের সারাদিন কাটে, তা বলতে পারবো না।

—তোমার মা ওখানে যান না?

—শৈবালের জন্মদিনে যান।

ও হাসতে হাসতে বলে, আমার জন্মদিনেও মেসোমশাই আমাদের বারাসতের বাড়িতে আসবেনই।

এবার আমি চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?

ও হাসতে হাসতে বলে, বিয়ের আগেই তো আমি ও বাড়ির বউ হয়ে গেছি।

একটু অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

—মাসিমা, আমাদের সঙ্গে শৈবালের পরিচয় হবার মাস খানেক আগেই ওদের সল্ট বাড়ির একতলা তৈরি হলেও দোতলা এখনও তৈরি হয়নি।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

—মেসোমশায়ের সঙ্গে একটু ভালভাবে পরিচয় হবার পরই উনি একদিন আমাকে বললেন, মা জননী, আমি এই বাড়ি তৈরি করলেও তুমিই হচ্ছো এ বাড়ির মালিক। এই বাড়ি কিভাবে সাজানো-গোছানো হবে, তা তুমিই ঠিক করবে।

ওর কথা শুনে আমি হাসি।

শ্রীরূপা গম্ভীর হয়ে বলে, মাসিমা, মেসোমশাই আমাকে নিয়ে বড় বড় দোকানে গিয়েছেন। আমি যা পছন্দ করেছি, উনি তাই কিনেছেন।...

—কেনাকাটার সময় শৈবাল তোমাদের সঙ্গে যায়নি?

—না, না, ও একদিনের জন্যও যায়নি।

ও প্রায় না থেমেই বলে, মাসিমা, ও বাড়িতে গেলে যা কিছু দেখবেন, সবই আমার পছন্দ করা। শুধু তাই না, এখন মেসোমশায়ের সুট-টুটের কাপড় থেকে শৈবালের জামা-প্যাণ্টের কাপড় পর্যন্ত আমাকে কিনতে হয়।

—খুব ভাল কথা।

একটু থেমে বলি, এদিক দিয়ে তো তুমি খুব সৌভাগ্যবতী।

—মাসিমা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—যাইহোক তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে?

—শৈবালের ফাইন্যাল আর আমার বি. এ পরীক্ষা হবার পর।

—তার মানে সামনের বছর?

—হ্যাঁ।

আমি দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলি, বাবার জন্য তোমার যত দুঃখই থাক, বিবাহিত জীবনে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।

শ্রীরূপা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মাসিমা আমার দুটো ভাইবোন যতদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন আমি ঠিক আনন্দে সংসার করতে পারবো না।

ও একটু থেমে বলে, আমি কোনদিন কোন পরীক্ষায় ফেল না করলেও খুব ভাল স্টুডেন্ট না। মোস্ট অ্যাভারেজ। কিন্তু আমার দুটো ভাইবোনই অসম্ভব ভাল স্টুডেন্ট। দুজনেই সায়েন্স ট্যালেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।...

—বাঃ! খুব ভাল কথা।

ও আমার কথা শুনেও শোনে না। বলে, শৈবালও ওদের দু'জনকে খুবই ভালবাসে।

তাই মনে হয়, ওরা দু'জন যাতে জীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

—নিশ্চয়ই করবে।

ওর ঘর থেকে বিদায় নেবার আগে জিজ্ঞেস করি, শৈবালের বাবা তোমাকে দেখতে এখানে এসেছেন?

—উনি তো এখানে নেই। মিডল-ইস্ট গিয়েছেন। পরশু ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় উনি ছুটে আসবেন।

আমার নর্ম্যাল ডেলিভারি হলেও কয়েকটা স্টিচ করতে হয়েছে। তাই আমাকে এই নার্সিং হোমে বেশ ক'দিন থাকতে হয়। প্রথমে যখন শুনি, আমাকে সাত-আট দিন এখানে থাকতে হবে, তখন মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার পর দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে।

যেসব নার্সরা আমাদের কেবিনগুলো দেখাশুনা করেন, তাঁদের মধ্যে মিনতিদি সবচাইতে বড়। বোধহয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হবে। একটু চাপা রং কিন্তু চোখ মুখ ভারি সুন্দর। সব সময় মুখে হাসি। হাজার কাজের চাপ থাকলেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা ক্লান্তি নেই। শত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে-মধ্যে আমাদের কেবিনে এসে বাচ্চাদের কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর না করে থাকতে পারেন না। বলেন, এদের একবার বুকে জড়িয়ে ধরলেই আমার সব ক্লান্তি চলে যায়।

অন্য নার্সরাও মিনতিদিকে খুবই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। দু'তিনজন তো খোলাখুলিই আমাকে বলেছে, এখানকার চাইতে বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছি কিন্তু শুধু মিনতিদির জন্য যেতে পারি না। উনি সব সময় আমাদের বলেন, নার্সের চাকরি করতে এসে শুধু টাকাটাই বড় কথা না। যেখানে নিরাপত্তা সম্মান-মর্যাদা পাওয়া যাবে, সেখানেই আমাদের চাকরি করা ভাল।

ছায়া বলেছিল, আমাদের যে কোন সমস্যা, ঝুট-ঝামেলা হোক, সব মিনতিদি সামলে দেবেন।

ও একটু থেমে একটু হেসে বলেছিল, আমাদের দু'একজনের স্বামী বড্ড অসভ্য। রোজ রাত্তিরে বিরক্ত করে। মিনতিদির পরামর্শে আমরা তাদেরও সামলেছি।

ওর কথা শুনে আমি হাসি।

—হাসছেন কি? মিনতিদি সত্যি আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেন।

ছায়া মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিল, হঠাৎ আমার ছোটবোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায়

মহাবিপদে পড়লাম। মাসখানেকের মধ্যে যে কি করে সব করবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন গতি না দেখে শেষপর্যন্ত মিনতিদিকে বলতেই উনি বৌবাজারের নাদুবাবুর দোকান থেকে ধারে সব গহনার ব্যবস্থা করে দিলেন।

—আচ্ছা, মিনতিদি বিয়ে করেননি কেন?

—ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে-থা দিতে দিতেই তো উনি শেষ হয়ে গেলেন। নিজের কথা ভাবার সময়ই পেলেন না।

আমার সঙ্গে সব নার্সেরই যথেষ্ট হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তবে শীলা নাইট ডিউটি দেয় বলে ওর সঙ্গে গল্পগুজব করার সুযোগ হয়েছে বলেই বোধহয় আমাদের মধ্যে খুব সুন্দর প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

শীলার বয়স বেশি না। বোধহয় ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। বেশ সুন্দর দোহারা গড়ন। চোখ দুটো ভারি সুন্দর। মাথায় এক রাশ কালো চুল। তাছাড়া বেশ ফর্সা। সব মিলিয়ে পরমা সুন্দরী। এর উপর বেশ একটু ছটফটে আর কথায় কথায় হাসতে পারে। ওকে দেখলেই মনে মনে বলি, কত ছেলে যে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে ও খাচ্ছে, তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

তবে একদিন ওকে বলেছিলাম, আমার কোন ভাই বা দেওর থাকলে ঠিক তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।

ও হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনার ভাই বা দেওর নেই বলেই তো আমি বিয়ে করতে পারছি না।

তারপর একদিন কথায় কথায় জানলাম, ও গত বছর দুয়েক ধরে রেগুলার নাইট ডিউটি দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শুধু নাইট ডিউটি দাও কেন? কষ্ট হয় না?

শীলা হাসতে হাসতে বলেছিল, নাইট ডিউটি দিতে কষ্ট হবে কেন? বরং অন্য ডিউটির চাইতে নাইট ডিউটি দিতেই ভাল লাগে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিল, অন্য সবার ঘর-সংসার আছে। আমার তো ওসব ঝামেলা নেই।

দু'চারদিন পর ওর কি একটা কথায় আমার সন্দেহ হলো, বিশেষ কোন কারণেই শীলা নাইট ডিউটি দেয়।

বললাম, শীলা, তুমি বোধহয় আমাকে বিশ্বাসও করো না, ভালোও বাসো না, তাই না?

—না, না, দিদি, তা বলবেন না। আমি সত্যি আপনাকে ভালোবাসি, বিশ্বাসও করি।

—তাহলে সত্যি করে বলো তো তুমি কেন মাসের পর মাস নাইট ডিউটি দাও?

শীলা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আবছা আলোয় দেখলাম, ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, দিদি, আমি রাত্রে একলা একলা শুতে পারি না। ঐ বিছানায় শুলেই সেই সর্বনাশা রাতের কথা মনে হয়।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, সর্বনাশা রাত মানে? কি হয়েছিল সে রাত্রে?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, প্রনবকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালবেসেছি। অসম্ভব ভাল ছাত্র ছিল। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স এ ফাস্ট ক্লাস পেল। তারপর রিসার্চ করার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে আমাদের বিয়ে হলো।

ও একটু থামতেই জিজ্ঞেস করি, তারপর?

—বিয়ের সাতদিন পর ও ব্যাঙ্গালোরে যায়। মাস চারেক পর হঠাৎ একদিন ফিরে আসতেই দেখি, গায় বেশ জ্বর। তাছাড়া হাত-পায়ের জয়েন্টগুলো ফোলা।

শীলা আবার একটু থামে, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট পাবার আগেই ও চলে গেল।

—কি বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, দিদি, ঠিকই বলছি।

ও আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ওর যে ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

হঠাৎ শীলা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দিদি, ও বোধহয় আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মরবে বলেই ব্যাঙ্গালোর থেকে এখানে এসেছিল।

আমি শুধু পিয়াসাকে নিয়েই নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরলাম না। আমি আরো অনেকের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েই ফিরে এলাম।

পিয়াসাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর আমার বাবা-মা শ্বশুর শাশুড়ি আর সার্থক এমন কাণ্ড-কারখানা শুরু করলেন যেন পৃথিবীতে এই প্রথম কারুর নাতনী বা মেয়ে হয়েছে।

মেয়ে জেগেই থাক বা ঘুমিয়েই থাক, আমার মা আর শাশুড়ি হুমড়ি খেয়ে ওকে দেখতে দেখতে কত কথা বলেন।

—দিদি, দেখো, দেখো, পিয়া হাসলে কি সুন্দর দেখায়।

—সত্যি বলছি দিদি, জীবনে কতজনের কত বাচ্চাই তো দেখলাম কিন্তু এ রকম সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি।

—না ভাই, আমিও দেখিনি।

আমার শাশুড়ি মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে পিয়াকে একবার দেখে নিয়েই আবার বলেন, মেয়েটার চোখমুখ দেখলে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

আমার মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, শুধু কি চোখ-মুখ? মেয়েটার মাথায় কি অসম্ভব চুল হবে বলো তো!

আমি পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে ওদের কথা শুনি আর হাসি। নিছক মজা করার জন্য ওদের কথার সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই ওরা দু'জনেই আমাকে বকুনি দেন।

আমার মা বেশ রাগ করেই বলেন, চুপ কর ময়না। তুই জীবনে ক'টা বাচ্চা দেখেছিস যে বলছিস, পিয়ার চোখ দুটো বোধহয় একটু ছোট হবে?

মা না থেমেই বলেন, তুই লিখে রেখে দে, আমি বলছি, তোর মেয়ের চোখ দুটো দেখেই লোকে পাগল হয় যাবে।

আমার শাশুড়ি একটু হেসে বলেন, বুঝলে অর্পিতা, আমার ছেলে হবার পর অনেকেই বলেছিলেন, ওর মুখখানা একটু বেশি গোলগাল আর নাকটা চ্যাপ্টা হবে। শুধু আমার মা আর শাশুড়ি বলেছিলেন, ও যত বড় হবে, ওর মুখখানা তত সুন্দর হবে।

উনি একটু থেমে একটু হেসে বলেন, এখন তো তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, তোমার স্বামীর মুখখানা দেখলেই মন ভরে যায়।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই তো নাতনীকে নিয়ে তো প্রায় পাগলামি শুরু করে দিলেন।

পিয়াকে দোলনায় ঘুমন্ত অবস্থায় মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে আমার বাবা শ্বশুর মশাইকে বলেন, বেয়াই মশাই, এ হতভাগী তো আরেক হেলেন অব ট্রয় হবে।

উনি হাসতে হাসতেই বলেন, এ ছুঁড়ির জন্য যে কত ছোকরা আত্মহত্যা করবে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

আমার শ্বশুরমশাই চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, আরে ভাই, ভবিষ্যতের কথা তো বাদই দিলাম। এই বিশ্বসুন্দরীকে দশ-পনের মিনিট না দেখলেই তো আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

আরো, আরো কত কি ওরা বলতেন।

আর সার্থক?

সারাদিন অফিসে খাটাখাটনির পর বাড়িতে পা দিয়েই ও মেয়ের কাছে ছুটে যেতো।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমি ঘরে ঢুকে ওকে দেখেই বলি, কি আশ্চর্য! তুমি এখনও অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোওনি?

সার্থক আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। মুগ্ধ হয়ে মেয়েকে দেখতে দেখতেই বলে,

পিয়াকে ছেড়ে সারাদিন অফিস করা যে কি কষ্টকর, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

আমি ঠাট্টা করে বলি, চাকরি ছেড়ে দাও।

—পিয়ার জন্য শুধু চাকরি কেন, আমি অনেক কিছুই ছাড়তে পারি।

—মেয়ের জন্য বোধহয় তুমি আমাকেও ছাড়তে পারো, তাই না?

ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েই দু'হাত দিয়ে আমার দুটো হাত ধরে আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, যে বেগম আমাকে পিয়ার মত মেয়ে দিতে পারে, তাকে ছাড়লে আমি বাঁচবো কাকে নিয়ে?

রাত্তির বেলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও দেখি, ও বেবি কটের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে মেয়েকে দেখছে।

আমি কিচ্ছু বলি না, শুধু আপনমনে হাসি।

এইরকম আনন্দের বন্যায় ভাসতে ভাসতেই পিয়াকে নিয়ে আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

তারপর দেখতে দেখতে একবার না, দু'বার না, দশবার গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত এলো আর গেল। কত কি ঘটে গেল এই সময়ের মধ্যে।

পিয়াকে দেখে ফিরে যাবার তিন মাস পরই বাবা রিটায়ার করলেন। রিটায়ার করার মাসখানেকের মধ্যে বাবা-মা দিল্লী ছেড়ে কাশী চলে গেলেন। ওখানে যাবার কয়েকদিন পরই বাবা আমাকে লিখলেন—মা ময়না, নতুন সংসার গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগলো বলেই এর আগে তোকে চিঠি লেখার সময় পাইনি। আমার অফিস আমাকে আরো পাঁচ বছর চাকরি করতে বলেছিল। বন্ধুবান্ধবরা বলেছিল, দিল্লীতেই ফ্ল্যাট কিনে থেকে যেতে কিন্তু আমি রাজি হইনি। কলেজ থেকে বেরুতে না বেরুতেই রোজগার করার জন্য পাগলের মত পরিশ্রম করেছি ও দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর আস্তে আস্তে চাকরিতে উন্নতি করেছি, আয়ও বেড়েছে। কর্মজীবনের শেষের দিকের প্রায় দশ-বারো বছর তো যা আয় করেছি, তার সিকি ভাগের বেশি আমাকে সংসারের জন্য খরচ করতে হয়নি। অফিসের বাড়ি-গাড়ি ছাড়াও টেলিফোন-ইলেকট্রিসিটির খরচও আমাকে দিতে হয়নি। রাজি হবো কেন?

রিটায়ার করার দিন সাতেক আগেই গ্রাচুইটি-প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক পেলাম। সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে ব্যাঙ্কের পাস বই দেখে বুঝলাম, আমি রীতিমত ধনী। নতুন করে চাকরি বা আয় করার কোন যুক্তিই দেখলাম না। তাছাড়া দিল্লীতে থাকতেও মন চাইলো না। এই শহরে মানুষের মন বৈভবের নেশায় এমনই সংক্রামিত যে আনন্দে খুশিতে

থাকতে পারবো না বলেই কাশী চলে এলাম।

দিল্লী-বোম্বে-ব্যাঙ্গালোরের মত ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্য এই শহরের নেই কিন্তু উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরের এই চির পবিত্র শহরের আকাশে-বাতাসে এমন কিছু আছে যা মানুষকে চিত্তশুদ্ধির ব্রতে ব্রতী করে।

জঙ্গমবাড়ির কাছে ছোট্ট দু'খানা ঘরের আস্তানায় আমরা নতুন করে সংসার পেতেছি। ঐ বাড়িবই দু'জন বিধবা দিদি আমাদের সংসারের সব কাজকর্ম করে দিচ্ছেন। আমাদের অনুরোধে ঐ দিদিরাও আমাদেরই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন। আমরা দু'জন সকাল-সন্ধে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে কাটাই। সত্যি বলছি, কি যেন এক অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দে আমরা দিন কাটাচ্ছি।

এই সঙ্গে সার্থকের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার ড্রাফট পাঠালাম। এই টাকা পিয়া দিদির উচ্চশিক্ষা বা বিয়ের জন্য ব্যয় করবে। তোর বড় পিসেমশাই বেশ ক'বছব আগে সোনারপুরে এক টুকরো জমি কিনেছে কিন্তু কোন ঘরদোর তৈরি করতে পারেনি। দু'খানা ঘরের ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরি করার জন্য তোর বড়পিসির নামে আজই এক লাখ টাকার ড্রাফট পাঠাচ্ছি। আমার ভাগ্নীদেরও কিছু পাঠালাম। বাকি টাকা আমাদের দু'জনের নামে ব্যাঙ্কে রেখেছি। আমাদের দু'জনের মৃত্যুর পর ব্যাঙ্কে যে টাকা থাকবে, তার অর্ধেক তোর আর বাকি অর্ধেক রামকৃষ্ণ মিশনে দিতে হবে।...

পিয়া যখন ছ'মাসের, তখন একদিন সাত সকালে বাবার টেলিফোন এলো।

—কে? ময়না?

—হ্যাঁ, বাবা, আমি ময়না।

মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করি, এত সকালে ফোন করছো...

—কাল মাঝ রাত্তিরে তোর মাকে হাসপাতালে দিয়েছি।

—মা'র কি হয়েছে?

আমি একটু চিৎকার করেই জিজ্ঞেস করি।

—হার্ট অ্যাটাক।

বাবা অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বলেন।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করি, মা কেমন আছে?

বাবা বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়েই বলেন, ডাক্তাররা তো ওষুধপত্তর দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তাছাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে কিছুই বলা যায় না।

আমার কান্না শুনেই বাবা বলেন, কাঁদছিস কেন? সবারই তো অসুখ-বিসুখ করে।

যাইহোক, এখনই তোর পিসিদের কিছু জানাতে হবে না। তবে তোরা যদি আসতে পারিস, তাহলে তোর বড়দিকেও সঙ্গে আনিস। ও তো নিজের মা'র চাইতে মামিকে বেশি ভালবাসে।

পরের দিন সকালেই পিয়া আর বড়দিকে নিয়ে আমরা কাশী পৌঁছলাম। সেদিন দুপুরেই মা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। তবে মারা যাবার আগে ঘণ্টাখানেক মা একবার চোখ মেলে আমাদের সবাইকে দেখলেন। আমি কোনমতে না কেঁদে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

মা ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে সামান্য একটু মাথা নেড়ে বললেন, না।

তার একটু পরেই সব শেষ।

আমি আর বড়দি পাগলের মত কান্নাকাটি করলাম। সার্থকও চোখের জল না ফেলে পারলো না কিন্তু বাবা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেললেন না। বরং একটু হেসে বললেন, কত ভাগ্যবতী পুণ্যবতী হলে এভাবে মরতে পারে!

বাবা মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, ও জানতো কখন মরতে হয়।

খবর পেয়েই পিসি-পিসেমশাইরা ছাড়াও আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কাশী এলেন। বাবা অত্যন্ত সাধারণভাবেই শ্রাদ্ধ-শান্তি করলেন কিন্তু মা'র আত্মার শান্তির কল্যাণে পাড়ার শত খানেক বিধবাকে একখানা করে থান ধুতি আর একশ' এক টাকা করে দিলেন।

সবকিছু মিটে যাবার পর হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বাবা আমাদের সঙ্গে কলকাতা এলেন না। বললেন, আমি কাশী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। এখানে থাকলে মণিকর্ণিকা আর দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলেই তোর মা'র দেখা পাবো। অন্য কোথাও গেলে তো ওর দেখা পাবো না।

ঠিক ছ'মাস পর কোন খবর-টবর না দিয়েই বাবা হঠাৎ কলকাতা এসে হাজির। আনন্দে খুশিতে মন ভরে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, কোন খবর দিলে না কেন? খবর দিলে তো আমরা স্টেশনে যেতে পারতাম।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, কাল সকালে হঠাৎ মনে হলো, তোদের সবাইকে একটু দেখে আসি। তাই চলে এলাম।

একটু থেমে বললেন, তাছাড়া সামনের রবিবার তো তোর মা'র জন্মদিন। ভাবলাম, তোদের সবাইকে নিয়ে ওর জন্মদিন পালন করবো।

রাত্তির বেলায় খেতে বসে বাবা বললেন, সার্থক, দু'তিন দিনের জন্য ছুটি নিতে পারবে? ভাবছিলাম আমার বোন-ভাগ্নী আর তোমাদের নিয়ে দীঘায় যেতাম। ওখানেই তোমার শাশুড়ির জন্মদিন পালন করতাম।

আমার শ্বশুর বললেন, দীঘায় কেন? উৎসবটা এখানেই হোক না।

—বেয়াই মশাই, ওকে নিয়ে দীঘা যাবার প্রোগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। তাই আর কি...

আমার শ্বশুর মশাইসঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই যাবেন।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি সার্থক, ছুটি পাবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছুটি পাবো।

—তাহলে আমি বোন-ভাগ্নীদের খবর দিই?

—আমিই ওদের খবর দিয়ে দেব। আপনি কেন কষ্ট করে...

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, নিজের বোন-ভাগ্নীদের বাড়ি যাবো, তাতে আবার কষ্ট কি!

পরের দিন সকালে চা-টা খেয়েই বাবা বেরিয়ে গেলেন। সন্ধের বেশ খানিকটা পর ফিরে এসেই এক গাল হাসি হেসে বললেন, সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সব ব্যবস্থা মানে?

—তিনখানা গাড়ি আর ব্লু ভিউ হোটেলে দোতলার ছ'খানা ঘর বুক করে এলাম।

সার্থক বলল, তিনখানা গাড়ি নিচ্ছেন কেন? আমার তো একটা গাড়ি আছে।

—না, না, তোমার গাড়ি নিতে হবে না। তুমি ড্রাইভ করলে গল্পগুজব করতে পারবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কি ছ'খানা ঘর লাগবে?

—তোর দুই পিসীর দুটো ঘর, দুই দিদির দুটো ঘর, একটা ঘর তোদের আর একটা ঘর আমার।

সত্যি, অভাবনীয় আনন্দে আমাদের দিনগুলো কাটলো। মা'র জন্মদিনে বাবা আমাদের প্রত্যেককে খুব সুন্দর শাড়ি আর জামাকাপড় উপহার দিলেন। শুধু তাই না। হোটেলের প্রত্যেককে মিষ্টি খাওয়ানো হলো।

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বাবার ঘরে বসে আমরা সবাই মিলে গল্পগুজব করলাম। একটা বেজে যাবার পর আমরা যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

ভোরবেলায় উঠে আমরা আবিষ্কার করলাম, বাবার ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না।

পিয়া জানতেও পারলো না, সে কি হারালো।

মানুষের চলার পথে ভাল-মন্দ যা কিছুই ঘটুক না কেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও এগিয়ে চলে। সুখের উপর দুঃখের আর দুঃখের উপর সুখের স্মৃতির পলিমাটি পড়ে

বলেই সংসার টিকে থাকে।

দেখতে দেখতে পিয়া বড় হয়। হামা দেয়, বসতে শেখে, দু'এক পা হাঁটতে পারে দেখেই আমরা সবাই আনন্দে খুশিতে মেতে উঠি। ওর মুখে বাব্‌বা-মাম্‌ মাম্‌ শুনে মনে হয় আমরা দু'জনে ধন্য হয়ে গেলাম। তারপর ও যেদিন আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে দাই দাই আর ঠাম্মা বলতে আরম্ভ করলো, সেদিন ওরা দু'জনে আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়লেন।

না, সময় ওখানেই থমকে দাঁড়ায় না। পিয়া আরো বড় হয়। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। লুকোচুরি খেলে ঠাম্মা আর দাই দাই' এর সঙ্গে। ধরা পড়লে হাসিতে সারা বাড়ি মাতিয়ে দেয়। সার্থক অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে ও সবার আগে ওকে অভ্যর্থনা জানায়। গর্বের সঙ্গে বলে, বাবা, দাই দাই আজ হেরে গেছে।

—আর ঠাম্মা?

—ঠাম্মা তো বল খেলতেই পারে না।

—আর মাম্‌ মাম্‌?

—মাম্‌ মাম্‌ও খেলতে পারে না।

সার্থক ওকে কোলে তুলে নিয়েই জিজ্ঞেস করে, ঠাম্মা কি পারে?

—ঠাম্মা খুব ভাল গল্প বলতে পারে।

—আর দাই দাই?

মাথা দোলাতে-দোলাতে পিয়া বলে, দাই দাই একটাও গল্প জানে না।

—আর মাম্‌ মাম্‌?

—মাম্‌ মাম্‌ গান জানে, গল্প জানেই না।

তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, পিয়া আরো বড় হয়েছে। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার শ্বশুরমশায়ের হাত ধরে টানাটানি করতে করতে বলে, ও দাই দাই! তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে পড়াবে না?

শ্বশুরমশাই সবিনয়ে নিবেদন করেন, দিদিভাই, আমি দাড়ি কেটে নিই?

—না, না, এখন দাড়ি কাটতে হবে না।

—আমি যে মুখে সাবান দিয়ে দিয়েছি।

—সাবান থাক ; তুমি এসো।

আমি বলি, পিয়া, দাই দাই দাড়িটা কেটে নিক। একটু পরে তুমি পড়তে বসো।

—না, না, একটু পরে তো আমি বল খেলবো।

শ্বশুরমশাই কি আর করবেন? মুখের সাবান ধুয়েই ওকে পড়াতে বসেন।

কোন কোনদিন পিয়াকে পড়াতে পড়াতেই শ্বশুরমশাই চিৎকার করে আমাকে ডাকেন, ও মা, শিগগির এসো।

হাতের কাজ ফেলে আমি ছুটে যাই। বলি, বাবা, আমাকে ডাকছেন?

উনি গর্বের হাসি হেসে বলেন, দেখো, দেখো; দিদিভাই কি সুন্দর অ-আ-ক-খ লিখেছে।

আমি কিছু বলার আগেই উনি বলেন, দেখো মা, তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। দিদিভাই যখন বি. এ-এম. এ পড়বে, তখন আমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবো না কিন্তু তুমি দেখে নিও, দিদিভাই লেখাপড়ায় অসম্ভব ভাল হ ।

আমি হাসতে হাসতে বলি, আপনার নাতনি কি কখনও খারাপ হতে পারে? ও সব ব্যাপারেই অসম্ভব ভাল হবে।

আমাদের কথাবার্তা শুনেই শাশুড়ি ঠাকরুণ এগিয়ে এসে বলেন, না, না, বৌমা। ঠাট্টার ব্যাপার না। তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, এইটুকু বয়সেই যে আবোল-তাবোলের ছড়া মুখস্থ করতে পারে, সেই মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল হবে না, তাই কখনো হয়?

সার্থক অফিস থেকে ফিরে গাড়িতে বসে বসেই হর্ন দেয় আর পিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। সার্থক ওকে এক চক্কর ঘুরিয়ে এনেই আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে আমাদের বলে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আজ পিয়া আমাকে বলল, বাবা, গিয়ারটা টেনে নামিয়ে দিয়ে আরো জোরে চালাও। আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেছি।

মেয়ের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার মনও আনন্দে-খুশিতে ভরে যায়। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে আমি যেন আনন্দের অমরাবতীতে পৌঁছে যাই।

বছরখানেক বয়স থেকেই পিয়া ওর ঠাম্মার কাছে শোয়। ঐ ঘরের মধ্যেই একটা ডিভানে আমার শ্বশুরমশাই ঘুমোন। তবে মাঝে মাঝেই মহারাণী হুকুম করেন, দাই দাই, আজ তুমিও আমার কাছে শোবে।

হাজার হোক নাতনীর হুকুম! ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পক্ষে সে হুকুম অগ্রাহ্য করা অকল্পনীয়। তাই তখন ঐ ডবল বেডের খাটেই নাতনীকে মাঝে নিয়ে ওদের শুতে হয়।

সে যাইহোক, আমরা দু'জনে শোবার পর প্রতিদিন মেয়ের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেই অন্তত ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তারপর সার্থক আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, বেগম, একটা কথা বলবো।

—বলো।

—তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, তখন থেকেই তোমাকে দেখছি। তুমি বরাবরই সুন্দরী কিন্তু পিয়া হবার পর তুমি যেন দিন দিন আরো বেশি সুন্দরী হচ্ছো।

আমি হাসতে হাসতে বলি, কি ব্যাপার? হঠাৎ আমার রূপের প্রশংসা করছো? কোন বদ মতলব আছে নাকি?

—মাঝে মাঝে বদ মতলব মাথায় না চাপলে পিয়াকে পেতে কি?

—কিন্তু পিয়াকে পাবার পর তোমার পাগলামি কেন বেড়ে গিয়েছে বলতে পারো?

—পিয়াকে পেয়েছি বলেই তো তোমাকে আরো বেশি ভাল লাগছে, ভালবাসছি।

সার্থক মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, মেয়ে হবার পর তোমার পাগলামিও অনেক বেড়ে গেছে।

—থাক, থাক। ইনিয়ে-বিনিয়ে ন্যাকামি করে কে আমাকে খেপিয়ে তোলে? তুমি নাকি অন্য কেউ?

—স্বামী হিসেবে আমি আমার কর্তব্য পালন করি। সে কর্তব্য পালন করা কি অন্যায়?

আমি হাসতে হাসতে বলি, দোহাই তোমার, এত ঘন ঘন তোমাকে কর্তব্য পালন করতে হবে না।

এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। শেষ হয় এক একটা বছর। পিয়া বড় হয়। স্কুলে ভর্তি হয়। বছরের শেষে নতুন ক্লাসে ওঠে। ওর রেজাল্ট দেখে শ্বশুর মশাই চিৎকার করে আমাদের বলেন, দেখো, দেখো, দিদিভাই কি নম্বর পেয়েছে। যে ফার্স্ট হয়েছে, সে ওর থেকে মাত্র তিন নম্বর বেশি পেয়েছে।

পিয়া ওর ঠাম্মার কোলে বসতেই উনি ওকে আদর করতে করতে বলেন, শুধু সন্ধেবেলায় ঘণ্টা খানেক পড়েই যদি এই নম্বর পায়, তাহলে...

ওনার কথার মাঝখানেই আমি হাসতে হাসতে বলি, একটু বেশি পড়াশুনা করলে পিয়া ঠিক একশ'র মধ্যে একশ' কুড়ি-পঁচিশ পেতো।

—না, না, বৌমা, ঠাট্টার কথা নয়। মেয়েটা আর একটু পড়াশুনা করলেই সব সাবজেক্টেই একশ'র মধ্যে একশ'ই পেতো।

শ্বশুরমশাই অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এসব তো বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আজ পিয়া দশ বছরের হলো। আজ আমি

স্বীকার করতে বাধ্য, ও লেখাপড়ায় সত্যি ভাল হয়েছে। তবে তার চাইতেও বড় কথা, ওর স্বভাব-চরিত্রের জন্যই ওকে সবাই এত ভালবাসে।

আমাদের কথা বাদই দিলাম। এমন কি মলিনাদিকে ও যা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তা ভাবা যায় না।

মলিনাদি এই সংসারে বহু বছর কাজ করছেন। আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়। আমার বিয়ের আগেই উনি বিধবা হন। বছর চারেক আগে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন ও বছরখানেক আগে একটা নাতি হয়েছে। ঐ নাতিকে দেখার জন্যই উনি মাঝে মাঝে দেশে যান। তবে দু'চারদিন পরই ফিরে আসেন।

আগে পিয়া যখন ছোট ছিল, তখন মলিনাদি দেশে গেলে শুধু বার বার জিজ্ঞেস করতো, ঠাম্মা, অনেক তো রাত হয়ে গেল। এখনও পিসি ফিরছে না কেন? বেশি রাত্তিরে পিসিকে যদি ভূতে ধরে?

—না, না, পিসিকে ভূতে ধরবে না। পিসি তো নিজের বাড়িতেই আছে।

—এইতো পিসির বাড়ি। পিসিকে তো কোথাও দেখছি না।

—পিসির আরো একটা বাড়ি আছে।

—ঠাম্মা, আমাকে পিসির বাড়ি নিয়ে চলো।

—তুমি আরো একটু বড় হলেই পিসির বাড়ি যাবে।

—আমি তো বড় হয়ে গেছি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি বড় হয়েছ কিন্তু আরো বড় না হলে তো পিসির বাড়ি যেতে পারবে না।

তারপর মালিনাদি ফিরে আসার পব পিয়া তাকে কত প্রশ্ন করে।

—পিসি তুমি যে বাড়িতে গিয়েছিলে, সে বাড়ি কোথায়?

—সে বাড়ি একটা গ্রামে।

—গ্রামে মানে?

—যেখানে গাছপালা আছে, নদী আছে, পুকুর আছে, মাটির বাড়ি, মাটির রাস্তা আছে...

ওর কথার মাঝখানেই পিয়া জিজ্ঞেস করে, পিসি, তোমার ঐ বাড়ি ভাল লাগে?

—খুব ভাল লাগে।

—তুমি আমাকে ঐ বাড়িতে নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

পিয়া যত বড় হয়েছে, পিসির গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে ওর আগ্রহ তত বেড়েছে। গত দু'বছর ধরে গরমের ছুটির সময় পিয়াও মলিনাদির সঙ্গে ওদের গ্রামে দু'চারদিন কাটিয়ে

আসে। ফিরে আসার পর ওর সেকি উত্তেজনা!

—জানো ঠাম্মা, জানো মাম্ মাম্, পিসিদের গ্রামটা কি বিউটিফুল। কত গাছ, কত পাখি দেখেছি, তা তোমরা ভাবতে পারবে না।

আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ও বলে যায়, আমাকে আম খাওয়াবার জন্য দাদা নিজে গাছে উঠে আম পেড়েছে। দাদা আমাকে সাইকেলে নিয়ে কত জায়গা ঘুরিয়েছে, তা তোমরা ভাবতে পারবে না।

আমার শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেন, দিদিভাই, তুমি নদী দেখেছ?

ও এক গাল হাসি হেসে বলে, ঠাম্মা, আমি নৌকা চড়েছি, ছিপ দিয়ে মাছও ধরেছি।

আমি একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, তুই ছিপ দিয়ে মাছও ধরেছিস?

—আমিই তো ছিপ ধরে বসে থাকতাম। দাদা শুধু টান দিয়ে জল থেকে মাছটাকে তুলে নিতো।

পিয়া এক নিঃশ্বাসে বলে, জানো ঠাম্মা, দাদা কত কি পারে।

—তাই নাকি?

—দাদার গাছে কত বেগুন, আলু, লঙ্কা, পেঁপে, আরো কত কি হয়েছে। দাদা সাইকেল চালাতে পারে, নৌকা চালাতে পারে, গাছে উঠতে পারে, মাছ ধরতে পারে।

ও একগাল হাসি হেসে বলে, দাদা খুব ভাল। আমি আবার দাদার কাছে যাবো।

আমি জিজ্ঞেস করি, বৌদি ভাল না?

—হ্যাঁ, বৌদিও খুব ভাল। আমি তো বৌদির সঙ্গেই পুকুরে চান করতে যেতাম।

—পুকুরে চান করতে ভয় করতো না?

—ভয় করবে কেন? বৌদি তো আমার হাত ধরে থাকতো।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে হাসতে হাসতে বলে, বৌদি আমাকে কত ভাল ভাল আচার খাইয়েছে।

পিয়া আরো কত কথা বলে।

পিয়া স্কুলে যাবার পর মলিনাদি বলে, জানো বৌদি, পিয়াকে নিয়ে যাবার সময় মনে মনে বেশ ভয় ছিল।

আমি অবাক হয়ে বলি, ভয় ছিল কেন?

—হাজাব হোক তোমরা বড়লোক। পিয়া জন্ম থেকেই মোটর গাড়ি চড়ছে। কলকাতা শহরে মানুষ হচ্ছে। সে ঐ অজ পাড়াগায়ে গিয়ে কি করবে, কি করে থাকবে, সেই চিন্তাতেই...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চাপা হাসি হেসে আমি জিজ্ঞেস করি, তারপর গ্রামে পৌঁছবার পর কি হলো?

মলিনাদি এক গাল হাসি হেসে বলে, আমাদের গ্রাম যেমন ওর ভাল লেগেছে, তেমনি ভাল লেগেছে বংশী আর বৌমাকে। প্রথম দিন পিয়া আমার কাছেই শুয়েছে কিন্তু তারপর রোজ দাদা-বৌদির কাছে শুয়েছে। পিয়াকে যে ওদের কি ভাল লেগেছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

আমি একটু হেসে বলি, বংশী আর বৌমা ওকে ভালবেসেছে বলেই তো পিয়াও ওদের ভালবেসেছে।

আমাদের বাড়ির রান্নাবান্নার ব্যাপারটা পুরোপুরিই মলিনাদি সামলে নেয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সবই ওর জানা আছে। তাই ও ব্যাপারে আমার বা শাশুড়ির বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না।

আমার শাশুড়ি হয়তো বললেন, মলিনা, তোমার মেসোমশাই বলছিলেন, অনেক দিন তেতোর ডাল হয় না।

মলিনাদি ঠিক একটু হেসে বলবেন, আজই তো তেতোর ডাল করেছি।

মা এক গাল হাসি হেসে বলেন, উনি আজই বলছিলেন আব আজই তুমি তেতোর ডাল করেছ?

—আমি তো জানি, মাঝে মাঝেই শুক্তো আর তেতোর ডাল না হলে মেসোমশায়ের ঠিক ভাল লাগে না।

কবে কি রান্না হবে, তাও মলিনাদি ঠিক করে। ওকে কিছু বলে দিতে হয় না। সার্থক যে পর পর দু'তিন দিনের বেশি মাছ খাওয়া পছন্দ করে না, তা জানা আচে বলেই মলিনাদি হয় ডিমের ডালনা না হয় মাংস করবেনই। দু'এক সপ্তাহ পর হয়তো ওসব না করে ছানার তরকারি বা ধোকার ডালনা করবে।

রান্নাবান্নার ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু ফরমায়েস না করলেও পিয়া মাঝে মাঝেই মলিনাদিকে বলে, পিসি, বৌদি যে রকম ডাল আর পোস্তর বড়া খাইয়েছিল...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মলিনাদি একটু হেসে বলে, কালই তোমাকে ঐ রকম ডাল আর পোস্তর বড়া খাওয়াবো।

কোনদিন আবার পিয়া বলে, পিসি, তোমার দেশের বাড়িতে গিয়ে যে রকম নারকেল দিয়ে কাঁকরোল সেদ্ধ মেখে দিয়েছিল, এখানে তো সেরকম খাওয়াও না।

—ঠিক আছে, এবার যেদিনই বাজার থেকে কাঁকরোল আসবে, সেদিনই তোমাকে ঐ রকম সেদ্ধ মেখে খাওয়াবো।

রান্নাবান্নার পালা চুকলে মলিনাদি মাঝে মাঝে আমাকে বলে, দেখো বৌদি, তোমার মেয়ে আমাদের দেশ-গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের মত ডাল-তরকারি খেতেই বেশি ভালবাসে। এত অল্পে মেয়েটা সন্তুষ্ট যে কি বলব!

যাইহোক রান্নাবান্না ছাড়াও সংসারে আরো হাজার কাজ আছে। রেখা বাসন-কোসন মাজে, ঘরদোর পরিষ্কার করে, কাপড় চোপড় কাচে কিন্তু আমাকেই সেসব কাপড় চোপড় মেলতে হয়, তুলতে হয়। আমাকেই ঘরদোর বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে হয়। কিছু না কিছু আনতে একবার আমাকেই দোকানে-বাজারে যেতে হয়। লোকজন এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, আপ্যায়ন করা, টেলিফোন ধরা ইত্যাদিও আমাকেই সামলাতে হয়। পড়াশুনা করা আর গান শোনার অভ্যাসটা আছে বলে বেশ কিছু সময় চলে যায়। তবু ফুরসত তো থাকেই। তখন আপনমনে পিয়ার কথা ভাবি। ভাবতে ভাবতেই কখনো হাসি, কখনো অবাক হই ; আবার কখনও কখনও চিন্তিতও হই।

প্রায় প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফিরে এসে পিয়া আমাদের একটা না একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলে।

ও এক গাল হাসি হেসে বলল, বিয়ের পর আজই প্রথম শীলাদি প্রথম আমাদের ক্লাস নিলেন। ওনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, তা আমি বলতে পারবো না।

আমার শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেন, কবে শীলাদির বিয়ে হলো?

পিয়া ঠোঁট উল্টে বলে, তা তো জানি না ; তবে ঠিক এক মাস পর আজই প্রথম স্কুলে এলেন।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, শীলাদিকে দেখতে বেশ সুন্দর কিন্তু বিয়ের পর ওনাকে আরো অনেক বেশি সুন্দর লাগছে।

—বিয়ের পর সবাইকেই সুন্দর লাগে।

—বিয়ের পর আমাকেও সুন্দর লাগবে?

ওর কথা শুনে আমরা হেসে উঠি।

পিয়া দু'হাত দিয়ে আমার শাশুড়ির মুখখানা ধরে বলে, ও ঠাম্মা, হাসছো কেন? বিয়ের পর আমাকে সুন্দর লাগবে না?

আমার শাশুড়ি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, বিয়ের পর তোমার দারুণ সুন্দর দেখাবে।

—দাই দাইকে বিয়ের পর তোমাকেও সুন্দর দেখাতো?

ওর প্রশ্ন শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠি।

—বলো না ঠাম্মা, তোমাকেও সুন্দর দেখাতো কি না।

—হ্যাঁ, আমাকেও সুন্দর দেখাতো।

বৃদ্ধার উত্তর আদায় না করে ও ছাড়ে না।

এইতো মাসখানেক আগের কথা।

স্কুলের ব্যাগ পড়ার টেবিলের উপর রেখেই পিয়া ছুটে এসে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল, জানো মাম্ মাম্, যে ইলাদি আমাদের অঙ্কের ক্লাস নেন, তিনি ভীষণ মিথ্যে কথা বলেন।

—না, না, টিচাররা কখনো মিথ্যে কথা বলেন না।

ও একটু রেগেই বলল, ক্লাসের সব মেয়েরাই মিথ্যেবাদী আর উনি একাই সত্যি কথা বলেন?

পিয়া মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, আজ উনি ক্লাসে ঢুকেই বললেন, তোমাদের হোম টাস্কের খাতাগুলো টেবিলের উপর রেখে যাও। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি তো হোম টাস্ক দেননি।

ও চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে উনি রেগে ফায়ার! আমাদের যা তা বকুনি দেবার পর সবাইকে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিলেন।

রাগে দুঃখে পিয়া বলে, আমাদের টিচাররাই যদি মিথ্যে কথা বলেন, তাহলে আমরা মিথ্যে বলতে তো শিখবই।

আমি শুনি দুঃখ পাই, অবাক হই। শুধু বলি, সব মেয়ে কখনই মিথ্যে কথা বলতে পারে না। এভাবে তোমাদের শাস্তি দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি।

তারপর ওকে একটু আদর করে বলি, যে ইচ্ছে মিথ্যে কথা বলুক, তুমি কখনও মিথ্যে কথা বলবে না।

—আমি তো কখনই মিথ্যে কথা বলি না।

পিয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কি চোর যে মিথ্যে কথা বলব?

—ঠিক বলেছ।

এইটুকু বয়সেই ওর বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যাই। এবার ওর জন্মদিনে কাদের নেমন্তন্ন করা হবে, তাই নিয়ে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম। আমার শ্বশুরমশাই বললেন, হাজার হোক এবার দিদিভাই দশ বছরের হবে। তাছাড়া ওর সামনের বছরের জন্মদিনের সময় থাকব কি না, তার ঠিক নেই। তাই এবার একটু বেশি লোকজনকে বলা হোক।

পিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি আমার সামনের বছরের জন্মদিনের সময় থাকবে না তো কোথায় যাবে?

উনি একটু হেসে বলেন, দিদিভাই, আমি কি বুড়ো হইনি? আমি তো যখন-তখনই

মরতে পারি।

—তুমি মরতে চাইলেই কি মরতে পারবে? তুমি কি ভীষ্ম।

ওর কথা শুনে আমরা হাসি।

শ্বশুর মশাই আবার বলেন, না, ভীষ্ম না কিন্তু মরতে তো পারি?

—দাই দাই, ডোন্ট টক্। চুপচাপ বসে থাকো। আমি পারমিশন না দিলে তুমি মরতেও পারবে না।

আমারশাশুড়ি বললেন, যাদের প্রত্যেকবার বলা হয়, তাদের তো বলতেই হবে ; তাছাড়া...

ওর কথার মাঝখানেই পিয়া মুখ বিকৃত করে বলে, ইস! তাদের বলতেই হবে! তুমি যাদের বলো, তারা যেন কত আমাকে ভালবাসে?

ও না থেমেই এক নিঃশ্বাসে বলে, দাই দাই যখন নার্সিং হোমে ছিল, তখন তোমার বোনেদের বাড়ি থেকে কেউ দেখতে এসেছিল?

শ্বশুরমশাই মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, দিদিভাই, তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে। তুমি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নিন্দা করছো?

—আমি কি তোমার মত তোমার বউকে ভয় করি যে চুপ করে থাকবো?

ওর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠি।

আমার শাশুড়ি হাসতে হাসতেই বললেন, ওরে হতভাগী, তোর দাই দাই আমাকে ভয় করে?

পিয়াও একটু হেসে বলে, ভয় আবার করে না ! তোমার 'শুনছো' 'শুনছো' ডাক শুনলেই তো দাই দাই প্রায় দৌড় তোমার কাছে যায়। ভয় না করলে কেউ ঐভাবে ছুটে যায়?

মলিনাদি ওর কথা শুনেই কোন মতে হাসি চেপে রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, অন্য বছরের তুলনায় এবার কিছু বেশি লোকজনকে বলা হবে।

পিয়া বলল, তাহলে এবার আমি ছ'সাতজন বন্ধুকে বলব।

ওর ঠাম্মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবে।

পিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মাম্ মাম্, তুমি শীলা মাসী-শ্রীরূপাদিদের আসতে বলেছ তো?

—আগে ঠিক হোক, এবারেও ওদের বলা হবে কি না।

—বলা হবে না কেন? ওরা আমাকে কি ভালবাসেন বলো তো!

সার্থক বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওদের নিশ্চয়ই বলা হবে।

—বাবা, আমার বন্ধুদের কিন্তু তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে। ওদের পৌঁছে না দিলে ওরা আসতেই পারবে না।

—হ্যাঁ, পৌঁছে দেব।

হাসপাতাল-নার্সিং হোমে থাকার সময় দু'পাঁচজন নার্স বা অন্য রুগীদের সঙ্গে সবারই আলাপ-পরিচয় হয়। হাসপাতাল-নার্সিং হোম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই তাদের ভুলে যায় কিন্তু কয়েকজনকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি। তবে দিনে দিনে যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, তারা হচ্ছে শীলা আর শ্রীরূপা।

আমার বেশ মনে আছে, পিয়াকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে বাড়ি আসার ঠিক সপ্তাহ খানেক পরেই শীলা এসে হাজির হয়েছিল। সেদিন ও বেশ দ্বিধা আর সঙ্কোচের সঙ্গেই বলেছিল, নার্সিং হোমে যাদের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের বাড়ি যাওয়া উচিত না জেনেও চলে এলাম পিয়াকে দেখতে। ওকে না দেখে ঠিক শান্তি পাচ্ছিলাম না।

শীলাকে দেখে শুধু আমি না, আমার শ্বশুর-শাশুড়িও খুব খুশি হয়েছিলেন।

আমার শাশুড়ি বলেছিলেন, যখন ইচ্ছে চলে আসবে। তুমিও তো পিয়ার মা। ধাত্রী মা। তোমরাই তো ওকে প্রথম ক'দিন লালন-পালন করেছ।

আমার শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, শীলা, তুমি তো আমাদের মেয়ের মত। এই বুড়ো-বুড়ীর বাড়িতে আসতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না।

পিয়াকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে শীলা বলেছিল, মাসিমা, নার্সিং হোমে কত বাচ্চাকেই তো নাড়চাড়া করতে হয়। একটু-আধটু মায়ায় যে জড়িয়ে পড়ি না, তা বলব না কিন্তু নার্সিং হোম ছেড়ে চলে যাবার পর কাজের চাপে তাদের ভুলে যাই। তবে আপনার নাতনীকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না বলেই চলে এলাম।

সেই শুরু।

আর এখন?

প্রতি সপ্তাহে না হলেও খুবই নিয়মিত শীলা আসে। সারাদিন পিয়া আর আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে রাত্তিরে ফিরে যায়। এরই মধ্যে পিয়া দু'একদিন নার্সিং হোমে টেলিফোন করে মাসর সঙ্গে কথা বলবেই।

আর শ্রীরূপা?

পিয়া যখন বছর তিনেকের, তখনই শৈবালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। আমরা দু'জনেই ওদের বিয়েতে গিয়েছিলাম। ভাইবোনকে নিয়ে ওর দুশ্চিন্তার পর্ব শেষ হয়েছে। বছর দুই আগে ওদের একটা ছেলে হয়েছে। শৈবাল বিশেষ সময় না পেলেও শ্রীরূপা মাসে

একবার অন্তু ছেলেকে নিয়ে আসবেই। জানলা দিয়ে ওদের গাড়ি দেখলেই পিয়া চিৎকার করে, ঠাম্মা, মাম্ মাম্, শ্রীরূপাদিরা আসছে।

তারপর ওর বাচ্চাকে নিয়ে পিয়ার কত আদর।

দিন এইভাবেই এগিয়ে চলেছে। তবে পিয়া যত বড় হচ্ছে, তত বেশি সুন্দরী হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমি নিজেও মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখি। না দেখে পারি না। আনন্দে খুশিতে মন ভরে যায়। আবার হঠাৎ কখনও কখনও ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও হয়। ভাবি, ও যখন আঠারো-বিশ বছরের হবে, ওর সারা দেহে টলমল করে উঠবে যৌবন, তখন ও কোন বিপদে পড়বে না তো? হঠাৎ কোন ছেলের পাল্লায় পড়ে কোন ভুল করবে না তো?

আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, পিয়া কখনই ভুল করবে না, করতে পারে না। এই বয়সেই ওর যা বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় বোধ, বড় হয়ে সে কি কখনও ভুল করতে পারে?

অসম্ভব।

তবে হাজার হলেও আমি মা তো! শত আনন্দের মধ্যেও এক টুকরো আশঙ্কার মেঘ সব সময় মনের মধ্যে দেখতে পাই।

সে যাইহোক, আজ সারাদিন ধরে মনে মনে প্রার্থনা করছি, আমার পিয়া যেন ভাল হয়, সুখী হয়, শান্তিতে থাকে।

।। দ্বিতীয় পর্ব।।

প্রিয় পিয়া,

ঠিক এক সপ্তাহ হলো আমরা দিল্লী এসেছি কিন্তু বিশ্বাস কর, এর মধ্যে একদম সময় পাইনি। বাবা দেড় বছর আগে বদলী হয়ে দিল্লী এসেছেন। অফিস থেকে খুব সুন্দর ফ্ল্যাট দিয়েছে। বাবা একটা ফোল্ডিং খাট কিনে এই দেড় বছর তাতেই শুয়েছেন আর অফিসের একজন গাড়েয়ালী দারোয়ান যা রান্না করেছে, তাই খেয়েছেন। সারা বাড়ি কি নোংরা হয়েছিল, তা তুই ভাবতে পারবি না।

আমরা এখানে পৌঁছবার ঠিক পরের দিন আমাদের কলকাতার বাড়ির মালপত্র নিয়ে লরি এসে পৌঁছলে মা আর আমি দু'জনে মিলে সব গুছিয়েছি। উঃ। এই ক'দিন কি অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা তুই কল্পনা করতে পারবি না।

যাইহোক, আজ আমি নিজের ঘরের নিজের টেবিলে বসেই তোকে চিঠি লিখছি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ক'দিন অসম্ভব ব্যস্ততার জন্য বুঝতে পারিনি, তুই আমার কত আপন, কত প্রিয়। কাল দুপুরেই বাড়ি সাজানো-গোছানোর কাজ শেষ হয়। তারপর খেয়েদেয়ে এক ঘুম দেবার পর বিকেল থেকেই শুধু তোর কথা ভাবছি। তোকে ছেড়ে এসে আমি যে কি হারালাম, তা এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পাবছি। শেষ পর্যন্ত রাত্তির বেলায় বিছানায় শোবার পর তোর জন্য কতক্ষণ কেঁদেছি, তা জানি না। কাঁদতে কাঁদতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই তো আজ সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই তোকে চিঠি লিখতে বসলাম।

আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, প্রথম দিনের কথা। একে অত নামকরা বেথুন স্কুল, তার উপর প্রথম দিন ক্লাস করতে যাচ্ছি। বেশ নার্ভাস লাগছিল। আমাকে দেখেই ক্লাসের প্রায় সব মেয়ে কি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল! আমার এত খারাপ লেগেছিল

যে চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। ঠিক তখনই তুই এগিয়ে এসে একটু হেসে আমাকে বলেছিলি, আমি পিয়াসা। তোমার নাম কি?

আমার মনে হলো যেন মরুভূমির মধ্যে একটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় পেলাম। আমিও একটু হেসে বললাম, আমার নাম ঈশিতা।

—বাঃ! কি সুন্দর নাম!

তুই হাসতে হাসতেই আবার বলেছিলি, যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে, সেই তো ঈশিতা।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, তোমার নামটা তো আরো ভাল, আরো আধুনিক।

ঘণ্টা পড়তেই তুই আমার একটা হাত ধরে বললি, এসো, আমার পাশে বসবে।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই তুই আমাকে বললি, চলো, এক সঙ্গে টিফিন খাবো।

গাছতলায় পৌঁছে দেখি, আরো তিনটি মেয়ে বসে আছে। তুইই দেবিকা, মাধুরী আর অপর্ণার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলি। তারপর তুই আমাকে বললি, আমরা মিলেমিশে টিফিন খাই। তোমার আপত্তি নেই তো?

আমি খুশি হয়েই বললাম, না, না, আপত্তির কি আছে? মিলে মিশে খেতেই তো বেশি আনন্দ।

আমার বেশ মনে আছে, মা আমাকে টিফিনের জন্য লুচি, আলুর দম আর সন্দেশ দিয়েছিলেন। তুই টিফিন বক্স ভর্তি করে হালুয়া এনেছিলি। দেবিকা আর অপর্ণা কি এনেছিল, তা আজ আর মনে নেই কিন্তু মনে আছে, মাধুরী টিফিন বক্স খুলতেই তুই বললি, দে, দে, আমাকে দে। মাসিমার হাতের তরকারি দিয়ে এইরকম পাতলা পাতলা রুটি খেতে আমার দারুণ লাগে।

শুধু তাই না। আমার মনে আছে, তুই একটুও হালুয়া নিলি না। আমরা বাকি চারজনে বাকি সবকিছু ভাগাভাগি করে খাবার পর পুরো হালুয়া আমরাই শেষ করেছিলাম।

সেদিন ছুটির পর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, স্কুল কেমন লাগলো?

—খুব ভাল।

—সব টিচারদেরই ভাল লেগেছে?

—হ্যাঁ, সবাই খুব ভাল পড়ান।

—ক্লাসের অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো?

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললাম, একটা দারুণ মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।

মা চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, দারুণ মেয়ে মানে?

—যেমন সুন্দর নাম, সেইরকমই সুন্দর দেখতে আবার সেইরকমই ভাল স্বভাব।

—কি নাম মেয়েটির?

—পিয়াসা।

—পিয়াসা!

মা সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বললেন, সত্যি সুন্দর নাম।

আমি চোখ দুটো বড় বড় করে বললাম, পিয়াসাকে কি সুন্দর দেখতে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

মা একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মা, সত্যি দারুণ দেখতে।

আমি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, যেমন সুন্দর চোখ-মুখ, সেইরকমই গায়ের রঙ। তবে সব চাইতে ভাল ওর স্বভাব।

আমাকে খেতে দেবার জন্য মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বললেন, তুই একদিনেই মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র পর্যন্ত জেনে গেলি।

মা'র এই কথাটা আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। মা-বাবারা কিছুতেই স্বীকার করেন না, ওদের চাইতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন অনেক স্বচ্ছ, মালিন্যমুক্ত। মানুষ যত বড় হয়, তার মনে তত বেশি দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় জমতে জমতে অন্যদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়। তাই তো কিশোব-কিশোরী যুবক-যুবতীরা যেভাবে মুক্ত কণ্ঠে অন্যের নিন্দা প্রশংসা করতে পারে, বয়স্করা কখনই তা পারেন না। ওরা অনেক হিসেব-নিকেশ না করে কখনই কারুর নিন্দা বা প্রশংসা করেন না।

আজ আমরা কেউই কচি বাচ্চা না। দু'জনেই অষ্টাদশী। দু'জনেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি। তাই তো পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা আজ খোলাখুলি না লিখে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন থেকেই মায়ের সঙ্গে আমার মতান্তরের শুরু।

সে যাইহোক আমাদের ফেলে আসা সোনারূপা দিনগুলোর সব কথা, সব স্মৃতি আবার নতুন করে আজ আমার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে আমার নবজন্মের ইতিহাস।

তুই তো জানিস, মা-বাবা আর দুই দাদাকে নিয়ে আমাদের সংসার। আমরা বড়লোক না হলেও বেশ স্বচ্ছলভাবেই আমাদের সংসার চলে। ঠাকুমা মারা যাবার

পর থেকে কাকাদের আসা-যাওয়া কমতে শুরু করে। ন'মাসে-ছ'মাসে কাকারা এক-আধঘণ্টার জন্য ঘুরে গেলেও কাকিমা বা খুড়তুতো দাদা-দিদি ভাইবোনরা কখনই আসতেন না। আত্মীয়দের মধ্যে শুধু ছোটমামাদেরই আসতে দেখেছি। আমি ছোটবেলা থেকে জেনেছি, এর বাইরে আমাদের আর কোন আপনজন নেই। এই ক'জনের সুখ-দুঃখের বাইরে অন্য কাউকে নিয়ে মা-বাবাকে কোনদিন চিন্তা করতে দেখিনি। আমিও ভাবতে পারিনি, এর বাইরের কাউকে শ্রদ্ধা করা যায় বা ভালবাসা যায় ; ভাবতে পারিনি এই ক'জনের বাইরের কোন মানুষ আমাকে ভালবাসতে পারে।

বেথুন স্কুলে ভর্তি হবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম, সংসারের চার দেয়ালের বাইরে এক বিশাল জগত আছে ; মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম, এই বিশাল জগতের জনারণ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে অসংখ্য প্রিয়জনকে।

তোর কথা আমি বাদই দিচ্ছি। ক'দিনের মধ্যেই আমি তো তোর প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, নতুন স্কুলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোর মত একজন বন্ধু পাবো। কিন্তু সব চেয়ে অবাক হয়েছিলাম মাধুরীকে দেখে ও জেনে।

বেথুনে ভর্তি হবার আগেই বেথুনের খ্যাতি-যশ শুনেছিলাম মা আর ছোটমামির কাছে। আমার ধারণা ছিল, ওখানে যারা পড়ে, তারা সবাই হয় বড়লোক, না হয় বেশ বিখ্যাত লোকেদের মেয়ে। বেথুন, গোখেল বা কমলা গার্লস ছাড়া অন্য স্কুলে কি তারা পড়তে পারে?

মাধুরীর সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশার পরই মনে মনে একটু খটকা লেগেছিল ঠিকই কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি, ওর বাবা হাতিবাগান বাজারের সামান্য দোকানদার। তোর কাছে এই ব্যাপারটা জেনে আমি চমকে উঠেছিলাম, বলিস কিরে?

তুই একটু হেসে বলেছিলি, কেন, দোকানদারের ছেলেমেয়েরা কি লেখাপড়া শিখতে পারে না?

আমি একটু আমতা আমতা করে বলেছিলাম, তা পারবে না কেন কিন্তু সাধারণত ঐ ধরনের ফ্যামিলির ছেলেরা একটু-আধটু লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরাও যে স্কুল-কলেজে যায়, তা কোনদিন শুনিনি।

তুই আবার হেসে বলেছিলি, মাধুরীর বড়দি মাধবীদি এই বেথুন কলেজ থেকেই বি. এ. পাস করার পরই ওর বিয়ে হয়েছে।

—তাই নাকি?

—মাধুরীর মেজদি মালতীদি স্কটিশে বি. এ. পড়ছেন।

—মাধুরীর কোন দাদা বা ভাই নেই?

—মাধুরীই সব চাইতে ছোট। ওর দাদা টাউন স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে।

তোর কাছে ওদের চার ভাইবোনের কথা শোনার পর আমি একটু অবাক হয়ে বলেছিলাম, তুই ওদের বাড়ির এত খবর জানিস?

—না জানার কি আছে?

তুই একটু থেমে বলেছিলি, মাধুরী যেমন আমাদের বাড়ির সব কিছু জানে, আমিও তেমনি ওদের সব কথা জানি।

—মাধুরী নিজেই তোকে সব বলেছে?

—হ্যাঁ ; তাছাড়া মাধুরী যেমন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে সারাদিন কাটায়, তেমনি আমিও তো ওদের ওখানে যাই।

—তোর বাবা-মা ঠাম্মা বা দাই দাই আপত্তি করেন না?

তুই হাসতে হাসতে বলেছিলি, আপত্তি করবেন কেন? আমি তো মা বা দাই দাই'এর সঙ্গেই ওদের বাড়ি যাই।

শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলেও মুখে কিছু বলতে পারিনি।

তারপর তুই জিজ্ঞেস করলি, যাবি একদিন ওদের বাড়ি? গেলে খুব ভাল লাগবে।।

—আমি বোধহয় যেতে পারবো না।

—কেন?

—মা কখনই পারমিশন দেবেন না।

আমি একটু থেমে বলেছিলাম, মা তো আমাকে যার-তার বাড়িতে যেতেই দেবেন না।

—তুই তো যার-তার বাড়িতে যাবি না ; তুই তো তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবি।

—মনে হয়, তোর বাড়িতে যাবার পারমিশন পাবো কিন্তু হাতিবাগান বাজারের দোকানদারের বাড়িতে গেলে মা আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন।

—না, না, তাহলে তোকে যেতে হবে না।

আমার কথাটা শুনে তুই খুবই অবাক হয়েছিলি, দুঃখও পেয়েছিলি কিন্তু মুখে কিছু বলিসনি। শুধু তাই না। তুই এত বুদ্ধিমতী যে পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তুই আমাকে ওদের পরিবার সম্পর্কে কখনই কিছু বলিসনি। আমার বেশ মনে আছে, হঠাৎ একদিন তুই আর মাধুরী দু'জনেই স্কুল কামাই করলি। পরদিন তোকে জিজ্ঞেস করতেই তুই বললি, আমার এক দূর সম্পর্কের দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম বলে কাল স্কুলে আসতে পারিনি।

একটু থেমে তুই বলেছিলি, ঐ দিদি আমাকে খুব ভালবাসেন।

মাধুরী বলেছিল বাড়িতে কাজ ছিল বলে আসতে পারেনি।

বেশ কয়েক বছর পরে যখন আমিও তোর সঙ্গে মাঝে মাঝে মাধুরীদের বাড়ি যেতে শুরু করলাম, তখনই একদিন পুরনো অ্যালবামগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে মালতীদির ছেলের অন্নপ্রাশনে তোর আর মাসিমার বেশ কয়েকটা ছবি দেখে জানতে পারলাম, সেদিন তুই আর মাধুরী দু'জনেই কেন স্কুলে আসিসনি।

তারপর একদিন কথায় কথায় মালতীদির ছেলের অন্নপ্রাশনের প্রসঙ্গ উঠতেই তুই বলেছিলি, যারা আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, আমার মা-বাবা ঠাম্মা-দাই দাইও তাদের অত্যন্ত ভালবাসেন, অত্যন্ত পছন্দ করেন।

তুই একটু থেমে হাসতে হাসতে বলেছিলি, ওরা যদি পছন্দ না করতেন, তাহলে কি আমি সেই ছোটবেলা থেকে প্রায় প্রত্যেক বছর পিসির সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে পারতাম?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি বোকার মত প্রশ্ন করেছিলাম, গ্রামের বাড়িতে থাকতে তোর ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন?

—গ্রামে বনজঙ্গল, কাঁচা রাস্তা, ইলেকট্রিসিটি নেই ; তাছাড় পাথেঘাটে সাপ-ব্যাঙ...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তুই গম্ভীর হয়ে বলেছিলি, হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস। তবে জেনে রাখ, গ্রামে যে আনন্দ পাওয়া যায়, গ্রামের মানুষের যে ভালবাসা পাওয়া যায়, তার কানাকড়িও শহরে পাওয়া যায় না।

প্রথম দিকে তোর কথাবার্তা শুনে আমি সত্যি অবাক হতাম। ভাবতাম, গ্রামে তো শুধু লেখাপড়া না জানা গরিব-দুঃখী চাষাচাষীরা থাকে। সেখানে মাটির বাড়িতে খড়ের চাল। কল ঘোরালেই জল পড়ে না। ইলেকট্রিসিটি নেই ; অমাবস্যার অন্ধকারেও ভরসা শুধু লম্ফ বা লণ্ঠনের আলো। তাছাড়া আমাদের বাড়ির ঝিয়ের কাছে শুনেছিলাম, গ্রামে কারুর বাড়িতেই বাথরুম-পায়খানা নেই। মেয়েরা অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠে মাঠেঘাটে বনে-জঙ্গলে কাজ সেরে আসে। চান করে নদীনালা পুকুরে। আমাদের গ্রামগুলো যে ঐরকমই হয়, তা তো পথের পাঁচালী বা আরো অনেক সিনেমাতেও দেখেছি।

কলকাতার কোন মেয়ে যে ঐ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। অবাক হয়েছি তোর বাড়ির লোকজনের কথা ভেবেও। ওরা যে কি করে সামান্য একজন রাঁধুনীর সঙ্গে তোকে তাদের গ্রামের

বাড়িতে যেতে দিলেন, তাও আমার মাথায় আসেনি।

তোদের মত কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম, শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে হয়ে অশিক্ষিত বা গ্রামগঞ্জের মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, মেলামেশা করাও উচিত না, সম্মানজনক না। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য।

তারপর আস্তে আস্তে বড় হলাম। বন্ধুবান্ধব আর আশেপাশের মানুষদের দেখতে দেখতে অনেক কিছু জানলাম, বুঝলাম। অভিজ্ঞতা বাড়ল তিলে তিলে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারার পরিবর্তন হলো। আজ আমি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি, শুধু দু'চারটে পরীক্ষায় পাস করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই ভদ্র সভ্য উদার মহৎ হবে, তার কোন মানে নেই! জমিজমা ঘর-বাড়ি সোনাদানা বা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা থাকলেই সংসার সুখের হয় না। মাধুরীদের বাড়িতে যেতে যেতেই আমি আবিষ্কার করি, যে সংসারে অভাব থাকলেই হাহাকার নেই, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা আর মমত্ব আছে, সে সংসার সুখের হয়, আনন্দের হয়।

তোদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে আমি প্রথম উপলব্ধি করি, মাটিতে বীজ পুঁতলে সে অঙ্কুরিত হতে পারে, তিলে তিলে বাড়তে পারে কিন্তু ভাল ফুল-ফল পেতে হলে যেমন সারের প্রয়োজন, ঠিক সেইরকমই প্রত্যেক শিশুরই প্রয়োজন দাদু-দিদুদের স্নেহ-মমতা আর অবিভাবকত্ব। তোর মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলব, দাই দাই আর ঠাম্মাকে ওভাবে কাছে না পেলে বোধহয় তোর এমন সুন্দর ব্যালান্সড্ ডেভলপমেন্ট হতো না। সে যাইহোক বছর দুয়েকের মধ্যেই তোর, আমার আর মাধুরীর মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমাদের জীবনে কি কি ঘটনা ঘটেছিল, তোর মনে আছে?

সব চাইতে, বড় কথা, ঐ বছরেই দু'তিন মাসের ব্যবধানে আমরা তিনজনেই 'বড়' হলাম, তাই না? প্রত্যেক মেয়েকেই যে প্রত্যেক মাসে এই দুর্ভোগ ভুগতে হয়, তা জেনে আমরা অবাক হয়েছিলাম। তাছাড়া প্রথম কয়েক মাস আমরা কি বিচিত্র ভয় ভীতি আশঙ্কায় থাকতাম, তা এখনও মনে হলে যেন শিউরে উঠি। একটা কথা তুই নিশ্চয়ই স্বীকার করবি, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মেয়েদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই বেঁচে থাকতে হয়। বলতে পারিস, শুধু মেয়েদেরই কেন, এভাবে সংগ্রাম করতে হবে? যে সমাজ দিবারাত্রি 'মা কালী' 'মা কালী' করে, বারো মাসের তের পার্বণে নানা দেবীর আরাধনা করে, সেই সমাজেই মেয়েরা কেন এত উপেক্ষিতা হবে বলতে পারিস? শুধু

বাহুবল আছে বলেই কেন পুরুষরা আমাদের উপর আধিপত্য করবে, তাও ভেবে পাই না।

তোর মনে আছে কি, ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকেই আমাদের ক্লাসের কয়েকজন মেয়ের মধ্যে একটু একটু করে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। দেবিকা আর অপর্ণা দু'জনেই আমাদের তিনজনের থেকে ছ'মাস-এক বছরের বড় ছিল ঠিকই কিন্তু ওদের দু'জনেরই বড্ড বেশি বাড়-বাড়ন্ত চেহারা ছিল। হ'াৎ দেখলে মনে হতো, ওরা আমাদের চাইতে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়ে। বোধহয় ক্লাস এইট বা নাইনে পড়ার সময়ই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দেবিকাই প্রথম প্রেমপত্র পায়, তাই না? দেবিকা যেদিন আমাদের ঐ চিঠিটা দেখায়, সেদিন আমরা যেমন ভয় পেয়েছিলাম, সেইরকমই অবাক হয়েছিলাম। যে ছেলেটা এই চিঠি লিখেছিল, তার নাম ভুলে গেছি কিন্তু মনে আছে, দেবিকা বলেছিল, ছেলেটা ক্লাস টেন'এ পড়ে আর ওদেরই সামনের বাড়িতে থাকে।

প্রকৃতির একটা ছন্দ আছে। গ্রীষ্মের দাহ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় আকাশে ঘনঘটা, নেমে আসে শ্রাবণধারা। বর্ষণক্লান্ত দিনের শেষেই দেখা দেন হাসিখুশি শরৎ-মহারাজ। তারপর শীতের কুয়াশাকে পরাজিত করেই আর্বিভূত হয় ঋতুরাজ বসন্ত। আবার চৈত্রের তাপ, মাঘের হিম, শ্রাবণের ধারায় অঙ্কুরিত হয় বীজ বিশ্ব প্রকৃতির এই ছন্দ, এই শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও কিছু কিছু মানুষ কেন যে অকাল-বসন্ত রোগে ভোগে, তা ভেবে পাই না।

এই চিঠি লেখার জন্য আমরা ছেলেটির নিন্দা করেছিলাম বলেই দেবিকা আস্তে আস্তে আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। যে ছেলে ঐ বয়সেই এত অসভ্য চিঠি লিখতে পারতো, তাকে যে দেবিকার কি করে ভাল লাগলো, তা ভগবানই জানেন। ওদিকে অপর্ণা সদ্য বিবাহিত দাদা-বৌদির কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতেই বছর খানেকের মধ্যে কি অসম্ভব পাকা হয়ে উঠল। ওকে দেখেই প্রথম বুঝতে পারি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিপথগামী করতে, অধঃপাতে যেতে ইন্ধন যোগান তাদেরই গুরুজনেরা। ছোট্ট একটা মা-বাবা দাদা-দিদি ভাইবোনের সংসারে কেউই এককভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাতে পারে না। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য।

আমাদের সুদেষ্ণার কথাই ধর। ক্লাসের সব মেয়েরাই জানতো, ওর বাবা ঘুষখোর পুলিশ অফিসার। তাছাড়া আমাদের সামনেই কনস্টেবলদের যে ভাষায় গালাগাল বকুনি দিতেন, তা যে কোনো ভদ্রলোক বলতে পারেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম

না। অথচ সুদেষ্ণার মা আর দাদা কি অসম্ভব ভাল ছিলেন! বাবাকে নয়, দাদাকেই সুদেষ্ণা জীবনের ধ্রুবতারা মনে করত বলেই ও যত বড় হয়েছে, তত ভাল হয়েছে। ওদের বাড়িতে গেলে আমরা তো ওর দাদার ঘরে শুয়ে-বসেই গল্পগুজব করে সময় কাটাতাম। তারপর দাদা কলেজ থেকে ফিরলেই যেন আমরা হাতে স্বর্গ পেতাম। এই দাদার কাছ থেকে আমরা কত কি জেনেছি, শিখেছি। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, তখনই যে আমরা সঞ্চয়িতা হাতে তুলে নিয়েছি, এখনও নিই, সে তো দাদার জন্যই।

আমার পিতৃদেব-মাতৃদেবীর ধারণা, সমবয়সী বা একটু ছোট-বড় ছেলেমেয়েদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাই তো ওরা আমাকে যেতে না দিলেও এই তো মাত্র বছর খানেকআগে তুই, মাধুরী আর সুদেষ্ণা তো দাদার সঙ্গে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছিলি। বছরখানেক আগে আমরা কেউই নেহাত শিশু ছিলাম না। আমাদের প্রত্যেকের দেহেই তখন বসন্তের সমাগম হতে শুরু করেছে। আর দাদা তো আমাদের চাইতেও বছর পাঁচেকের বড়। অর্থাৎ ষোল আনা যুবক।

ওখান থেকে ফিরে আসার পর তোদের কাছেই শুনেছি, সন্ধের অন্ধকারে প্রান্তিকের মাঠে বসে তোরা সবাই মিলে গল্প করেছিস, গান গেয়েছিস ; আবার রাত একটু গভীর হলে পূর্বপল্লীর মাঠে বসে থাকতে থাকতে দাদাই তোদেব দূরের আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডল চিনিয়েছেন। তোরা কেউই এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মধ্যে কোন দৈন্য, কোন দুর্বলতা, মালিন্য দেখিসনি।

মানুষ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানব ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা আদর্শ-মহানুভবতার কাহিনীর পাশাপশি বহুজনের নীচতা, দৈন্য, কামনা-বাসনা-লালসার কলঙ্কময় কাহিনী। তাই তো বড্ড বেশি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এগুতে হয়। ক্ষণিক মোহ-চাঞ্চল্য বা দুর্বলতার জন্য মেয়েদের যে বিপদ, বিপর্যয় হতে পারে, তা তো ছেলেদের জীবনে কখনই ঘটবে না। আমাদের বন্ধু দেবারতিই তো সামান্য ভুলের জন্য কি শাস্তি, কি দুঃখই পেল।

হ্যাঁ, ভাল কথা। একদিন তোদের বাড়িতে গিয়ে মাসিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, অমন বাপের ছেলে হয়েও সুদেষ্ণার দাদা এত ভাল হলেন কি করে?

মাসিমা একটু হেসে বলেছিলেন, তুমি জানো না ঈশিতা, মাতালের ছেলেমেয়েরাই মাতালকে সব থেকে বেশি অপছন্দ, সব চাইতে বেশি ঘেন্না করে?

উনি একটু থেমে বলেছিলেন, ময়রার ছেলেমেয়েরা তো মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।

সত্যিই তাই ; যারা অন্ধকারে থাকে, তারাই তো আলোর সাধনা করে।

তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দু'একজন বন্ধু ভুল করলেও আমাদের ক্লাসের অধিকাংশ মেয়েই বেশ ভাল ছিল। সবার মধ্যেই যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা কখনই নয় কিন্তু আমরা কেউ ঝগড়াঝাটি মারামারিও করিনি। অবশ্য তার জন্য আমাদের কৃতিত্বের চাইতে স্কুলের পরিবেশই বেশি দায়ী ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যাসাগর-ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য যে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা আজও একটা অ.দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখন প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে আমাদের টিচারদের কথা। প্রত্যে.কই কত যত্ন নিয়ে পড়াতেন। তাছাড়া তুই, মাধুরী আর আমি তো কয়েকজন টিচারের রীতিমত ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম, তা না?

সব চাইতে বেশি করে মনে পড়ে কাকলিদির কথা। উনি ক্লাসে ঢুকলেই মনে হতো যেন গেয়ে উঠি—

ওগো বধূ সুন্দরী,
তুমি মধুমঞ্জুরী,
পুলকিত চম্পার
লহ অভিনন্দন—

আমরা সবাই তো ওঁর পি জন্য হাঁ করে বসে থাকতাম। ঈশ্বর ওঁকে শুধু রূপ দেননি, দিয়েছেন লাবণ্য শুধু সুন্দরী করেননি, সর্বাঙ্গে দিয়েছেন শ্রী। উনি যখন ওঁর ঐ স্বপ্নভরা হাসিমাখা সুন্দর দুটো চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন, তখন তো আমরা পাগলা হয়ে যেতাম। মনে হতো, ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি। তাছাড়া কি সুন্দর কথা বলতেন, কি সুন্দর পড়াতেন। ওঁর পিরিয়ড শেষ হলেই আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে যেতো।

তাছাড়া কাকলিদির হাঁটাচলারও আশ্চর্য ছন্দ ছিল। মনে আছে, ওঁর হাঁটাচলা দেখার জন্য আমরা কিভাবে বসে থাকতাম?

আজ আমাদের স্বীকার করতেই হবে, স্কুলের ঐতিহ্য আর পরিবেশ ছাড়াও বড় দিদিমণি, কাকলিদি, শ্রীলাদি, মহুয়াদি বা চৈতিদিদের কয়েকজন টিচারের জন্য অন্তত আমরা অভাবনীয়ভাবে প্রভাবান্বিত ও উপকৃত হয়েছি। সব স্কুলেই পাঠ্যবই পড়ানো হয়। আজকাল তো অনেক স্কুলেই অনেক অনুষ্ঠান হয় কিন্তু ক'টা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা বাড়াতে পারেন? ভদ্র-সভ্য-মার্জিত ও সর্বোপরি দায়িত্বশীল উপযুক্ত নাগরিক হবার ভিত্তি রচনা করতে পারেন ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা? ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র গঠনে বা আদর্শবান-আদর্শবতী হতে সাহায্য করেন?

শৈশবে-কৈশোরে ছেলেমেয়েরা অবশ্যই বাবা-মা দাদা-দিদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে তারা সমানভাবে তাদের উপর প্রভাব পড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। প্রতিদিনের মেলামেশায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চারিত্রিক ঔদার্য-মহত্ত্ব বা দৈন্য তিলে তিলে ছেলেমেয়েদের সামনে প্রকাশ পায়। আবার এর বিপরীতটাও ষোল আনা সত্য। বাড়িতে আমরা সবাই ভাল, সবাই ভদ্র কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরুলেই আমাদের আসল রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাইতো টিচাররা আমাদের যেসব খবর রাখেন, মা-বাবারা তা জানতেই পারেন না।

অন্যদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। আমি আমার কথা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই। যখন প্রথম বেথুনে ভর্তি হই, তখন আমি অসভ্য না থাকলেও রীতিমত স্বার্থপর আর অসামাজিক ছিলাম। তাছাড়া মোটামুটি বেশ ভাল গান গাইতে শিখেছিলাম বলে মনে মনে বেশ অহংকারীও ছিলাম। কবে কি কারণে যেন তোদের মত কয়েকজন বন্ধুকে গান শোনাবার দু'এক মাস পরই ক্লাসে ক্লাসে সার্কুলার এলো—বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দিন যারা নাচ-গান ও নৃত্যনাট্যে অংশ নিতে চাও, তারা যেন আগামী শনিবারের মধ্যে মিউজিক টিচারের কাছে নাম দেয়।

তার পরদিন কাকলিদি ক্লাসে এসেই জিজ্ঞেস করলেন, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনের অনুষ্ঠানে নাচ-গান বা ডান্স ড্রামায় অংশ নেবার জন্য তোমাদের কে কে নাম দিয়েছ?

তুই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললি, আমাদের ক্লাসের রুদ্রাণী যে ভাল নাচে, তা তো সারা স্কুলই জানে। তবে ঈশিতা যে এত ভাল গান জানে, তা আমরা আগে জানতাম না।

মাধুরী আর দেবিকাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, দিদি, ঈশিতার গান শুনে আমরা অবাক হয়ে গেছি।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, আমাদের স্কুলের অনেক মেয়েই খুব ভাল গাইয়ে আর তারাই শুধু অনুষ্ঠানে চান্স পাবে। আমাকে নিশ্চয়ই কেউ চান্স দেবে না। তাই তো তোদের কথা শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, বোধহয় আমাকে অপমানিত অপদস্থ করার জন্যই তোরা চক্রান্ত করে কাকলিদির কাছে আমার গানের প্রশংসা করলি। মনে মনে তোদের উপর ভীষণ রাগ হয়েছিল।

যাইহোক, কাকলিদি সঙ্গে সঙ্গেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ঈশিতা, আমার কাছে এসো।

অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ আর বিরক্তি সত্ত্বেও আমি ওর কাছে যেতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুদের কি গান শুনিয়েছ?

আমি জবাব দেবার আগেই তোরা দু'তিনজনে প্রায় চিৎকার করে উঠলি, ও আমাদের অনেক গান শুনিয়েছে।

কাকলিদি সেই চিরপরিচিত প্রাণভোলানো হাসি হেসে আমাকে বললেন, বন্ধুদের গান শোনালে আর আমাকে শোনাবে না?

আমি লজ্জায় মুখ নিচু করে চুপ করে থাকি।

উনি আলতো করে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, লজ্জা কি? আমি কি তোমার পর? নাকি তোমাকে আমি স্নেহ করি না, ভালবাসি না?

আমি মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে বলি, ন না, তা না।

—তবে মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, যদি আমার জানা গান হয়. তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে গলা মেলাব।

এবার আমি এক গাল হাসি হেসে শুরু করি—

এই কথাটি মনে রেখো,
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে কাকলিদিও আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠলেন—

শুকনো ঘাসে
শূন্য বনে
আপন মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।...

সেদিন কাকলিদি আর তোদের সবার আনন্দ দেখে, প্রশংসা শুনে আমি মুগ্ধ বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। তোদের জন্যই পরের দিনই সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি নাকি দারুণ গাইয়ে।

তোদের সবার সে ঔদার্যের স্মৃতি আমি কি কোনদিন ভুলতে পারবো? ভুলতে পারবো কি প্রধানত তোর জন্যই স্কুলের সব টিচার আর ছাত্রদের কাছে নতুন মর্যাদা পেয়েছি?

স্কুলের সেইসব দিনগুলোর খুঁটিনাটি লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবে একথা আমাদের সবাইকেই স্বীকার করতে হবে, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবার আগেই আমাদের জীবনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের দেহ-মনে এলো রীতিমত বিপ্লব। হঠাৎ কে যেন আমাদের সবার চোখে নতুন এক স্বপ্নের কাজল পরিয়ে দিলেন। কিশোরী থেকে যৌবনের সিংহদ্বারের মুখোমুখি হয়ে শুধু আমরা

রোমাঞ্চিত হইনি, অন্যদের মনেও শিহরন জাগিয়েছি।

তুই যেদিন প্রথম শাড়ি পরে আমাদের বাড়ি এসেছিলি, সেদিনের কথা নিশ্চয়ই তুই ভুলে যাসনি। বোধহয় কোনদিনই ভুলতে পারবি না।

সেদিন তুই 'বেল' বাজাতে না বাজাতেই ছোড়দা দরজা খুলেছিল। আমি দোতলার ব্যালকনিতে এসেই দেখি, ছোড়দা মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তোর দিকে তাকিয়ে আছে। তুইও চাপা হাসি হাসতে হাসতে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছিস। দু'এক মিনিট তোরা কেউই কোন কথা বলতে পারলি না। ঐ দৃশ্য দেখতে যে আমার কি মজা লেগেছিল, সে আর কি বলব!

ঐ কয়েক মিনিটের তোরা দু'জনেই বোধহয় ভুলে গিয়েছিলি, এই পৃথিবীতে আর কোন মানুষ বাস করে। তোরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিসনি, তোদের এই 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'র অবিস্মরণীয় ঐ মুহূর্তের কেউ সাক্ষী থাকতে পারে।

কীরে মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে, ছোড়দা চাপা হাসি হেসে ডান হাত তোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসো।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তুইও নির্বিবাদে ছোড়দার হাত ধরে ঐ তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এলি।

আসল কথা কী জানিস? এ সংসারে প্রত্যেক নারী-পুরুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে, যখন সে মনের মানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়, পূর্ণ হয়। জীবনের এই লোভনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্বের শুরু হয় ভাল লাগা দিয়ে।

শিউলি ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়ে। ভোরের শিশির সূর্যের প্রথম আলো দেখেই কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তবু এদের মাধুর্য আমাদের মনে দোলা দেয়। আমি জানি,কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের এই ভাল লাগার মুহূর্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না, হতে পারে না কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হবে, ঐ সামান্য ভাল লাগার মধ্যে দিয়েই আমাদের জীবন সঙ্গীতের আলাপ শুরু হয়।

বয়সের তুলনায় তুই বরাবরই যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও যুক্তিবাদী। অহেতুক উত্তেজনায় বা ভাবাবেগে তুই কোনদিনই কিছু করিসনি। কিন্তু তবু তুইও তো মানুষ! জীবনের ধর্মকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা তোরও হলো না।

সেদিন যে শুধু ছোড়দা আর আমি বাড়িতে আছি, তা জেনেশুনেই তুই সেদিন এসেছিলি। পিয়া, তুই স্বীকার করবি কি না জানি না কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, শুধু ছোড়দাকে মুগ্ধ করার জন্যই তুই সেদিন ঐভাবে সেজেগুজে এসেছিলি।

যৌবনে ছেলেরা নিজেদের সব দৈন্য লুকিয়ে রেখে মহত্ত্ব উদারতা আর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েই মেয়েদের মন হয় করার চেষ্টা করে। আর আমরা মেয়েরা? বিদ্যা-বুদ্ধি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার আগেই রূপ-লাবণ্য দেখিয়ে ছেলেদের মুগ্ধ করতে চাই। শুধু খাজুরাহো-কোনার্কের আমলের নারীরা না, আজকের আমরাও এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারিনি।

সে যাইহোক, ঐ সময় তোকে আর ছোড়দাকে দেখে আমার খুব মজা লাগতো। হঠাৎ যখন তখন কারণে অকারণে তুই আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া শুরু করলি। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তুই অত্যন্ত সচেতন হয়ে গেলি। না, মুখে রং-চং বা ঠোঁটে লিপস্টিক না লাগালেও শাড়ির রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কপালে একটা টিপ, শ্যাম্পু করা উড়ন্ত চুল, বাঁ হাতে একটা ঘড়ি আর ডান হতে দু'একটা বইখাতা নিয়ে তোকে আসতে দেখেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো, পিয়া, তোকে দারুণ সুন্দর লাগছে।

—তুই তো সব সময়ই আমাকে সুন্দর দেখিস।

পাশে দাঁড়িয়ে ছোড়দা একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, পিয়া, সত্যি তোমাকে খুব ভাল লাগছে।

কোনদিন আমার কাপড়-চোপড় নিয়ে আলোচনা উঠলে মা বলতেন, পিয়াকে কোনদিন একটা খুব দামী শাড়ি পরতে দেখলাম না কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর প্রিন্টের শাড়ি পরে যে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

ছোড়দা সঙ্গে সঙ্গে বলে, মেয়েটার রুচি দেখে অবাক হতে হয়।

আমি চুপ করে শুধু ওদের কথা শুনি। মনে মনে হাসি।

তুই দু'চারদিন আমাদের বাড়ি না এলেই ছোড়দা হঠাৎ আমাদের স্কুলের প্রসঙ্গে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই আমাকে বলবে, হ্যাঁরে, পিয়াসার কি খবর? তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? আজকাল আর ও তোর কাছে আসেই না!

আমি হাসি চেপে বলি, পিয়া তো গত শনিবারই এসেছিল।

—না, না, এই শনিবার আসেনি। হয়তো...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই শনিবারই এসেছিল।

আমি একটু থেমে বলি, পিয়া স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য যে লেখাটা লিখেছে, সেই লেখাটা শনিবার তোকে দেখিয়েছিল, তা তোর মনে পড়ছে?

ছোড়দা দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে একটু ভেবে বলল, সেটা গত শনিবারের আগের শনিবারের কথা না?

আমি একটু চাপা হাসি হেসে বলি, ওকে কি কাল আসতে বলব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসতে বলিস তো। ঐ লেখাটা আর একবার দেখে দেখো।

ছোড়দা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, কাল তো বিশ্বকর্মা পূজার ছুটি। কাল তো তোর সঙ্গে ওর দেখাই হবে না।

—তোর চিন্তা নেই। আমি টেলিফোন করে ওকে আসতে বলব।

আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখলেই ছোড়দা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করবে, তুই কি পিয়াসার সঙ্গে কথা বলছিস?

আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই ও বলবে, দেখি দেখি, আমাকে একটু দে তো। আমার একটা বই বোধহয় ওর কাছে আছে। বইটা কালই আমার চাই।

আরো মজার কথা শুনবি?

ছোড়দা রোজ রাত্তিরে ডায়েরি লেখে। আগে ডায়েরিটা ওর পড়ার টেবিলের উপরেই পড়ে থাকতো। সারা দিন কিভাবে কাটিয়েছে, তাই পাঁচ-দশ লাইনে লিখে রাখতো। ইদানীং আবিষ্কার করেছি, ছোড়দা আর ডায়েরিটা কখনই টেবিলের উপর রাখে না ; লুকিয়ে রাখে। যা লুকিয়ে রাখা হয়, যা বারণ করা হয়, তার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকবেই। সুতরাং আমিও লেগে পড়লাম, ওর ডায়েরি খুঁজে বের করতে। দু'দিন অনেক কিছু ঘাঁটাঘাটি খোঁজাখুঁজির পর ডায়েরি পেলাম ওর বিছানার তোষকের নিচে।

পিয়া, তুই জেনে নিশ্চয়ই সুখী হবি, ঐ ডায়েরির পাতায় পাতায় তোর কথা লেখা আছে।.

...পুরো এক সপ্তাহ পরে পিয়া আজ আমাদের বাড়ি এসেছিল। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে ওকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল। আসল কথা হচ্ছে, ওকে যখন যে পোশাকেই দেখি না কেন, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর দুটো চোখের পর চোখ রেখেই আমার মন প্রাণ ভরে যায়।...

...আজ অসম্ভব টায়ার্ড হয়ে বাড়ি ফিরলাম কিন্তু বাড়িতে এসেই অপ্রত্যাশিতভাবে পিয়াকে দেখেই এক মুহূর্তে আমার সব ক্লান্তি চলে গেল।...

...আজকাল পিয়াকে না দেখলেই মনে হয়, এমন দুঃখের দিন আমার জীবনে আর কখনো আসেনি।...

...আগে বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়তাম আর এখন? শোবার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ার কথা ভাবি। ওকে নিয়ে কত কি স্বপ্ন দেখি।...

...আমাদের পাড়ার অন্তত দুটি মেয়ের সঙ্গে আমার রীতিমত বন্ধুত্ব আছে কিন্তু ওদের নিয়ে মনে মনে কোন অলীক স্বপ্ন দেখিনি। পিয়া—শুধু পিয়াই আমাকে পাগল করে দিয়েছে।

জানি না, তুইও ছোড়দাকে নিয়ে এই ধরনের ডায়েরি লিখতিস কি না। তবে ছোড়দার ঐ ডায়েরির মধ্যেই তোর ছোট্ট দুটো চিঠি ছিল। আমি ঐ চিঠি দুটোও পড়েছি। না, ইনিয়ে-বিনিয়ে কোন ন্যাকামি করিসনি কিন্তু চিঠি দুটো পড়লেই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়, ছোড়দার প্রতি তোর ভালবাসা।

ছোড়দা আই-আই-টিতে ভর্তি হয়ে হঠাৎ কানপুর চলে না গেলে বোধহয় তোদের ব্যাপারটা আরো একটু এগিয়ে যেতো। তাছাড়া ঠিক ঐ সময়ই তোর দাই দাই মারা যাওয়াতে তুই এমন মুষড়ে পড়লি যে তখন তোর কাছে সারা পৃথিবীটাই অন্ধকার ডুবে গেল।

প্রায় সব ছেলেমেয়ের জীবনেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে। ঘটবেই। যাদের জীবনে ঘটে না, তাদের অদৃষ্ট নেহাতই খারাপ। আসল কথা হচ্ছে, এই ধরনের প্রেম-প্রীতি ভাল লাগা-ভালবাসাই তো মানুষকে বেঁচে থাকতে, লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করে। মরুভূমিতে যেমন গাছপালা লতা-গুল্মের জন্ম হয় না, সেইরকম প্রেম-প্রীতিহীন মানুষের জীবনও আনন্দময় মধুময় সাফল্যমণ্ডিত হয় না, হতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী ভোরের শিশিরের মত প্রথম প্রেম স্বল্পায়ু হলেও, তা আমাদের অন্তত এক ধাপ এগিয়ে দেয়। জীবনে এগিয়ে চলার পথে সাহায্য করে।

তোর জীবনে যেমন ছোড়দা এসেছে, আমার জীবনেও কৃশাণুদা এসেছে এবং চলেও গেছে। তা হোক। তবু স্বীকার করবো জীবনকে নতুন করে ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি কৃশাণুদার সান্নিধ্যেই। ওকে আমি কোনদিন ভুলব না। আমাদের সবার জীবনেই প্রথম ও প্রধান পুরুষ হচ্ছেন বাবা কিন্তু যে ভালবাসাকে অবলম্বন করে আমাদের সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, তার প্রথম স্বাদ তো পেয়েছি ব্যর্থ প্রথম প্রেমের জন্যই। তাই তো যদি কোনদিন আমাকে বা তোকে আত্মজীবনী লিখতে হয়, তাহলে সেখানে আমাদের এই ছেলেখেলার ইতিহাস নিশ্চয়ই লিখতে হবে, তাই না?

চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল কিন্তু তবু অনেক কথাই লেখা হলো না। তুই তো দু'বার দিল্লী এসেছিস কিন্তু আমি তো এই প্রথম এলাম। নিঃসন্দেহে কলকাতার তুলনায় সহস্রগুণ সুন্দর। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট তো দূরের কথা, এখানকার দোকান-বাজারগুলোও কত পরিচ্ছন্ন, কত সাজানো-গোছানো। কলকাতার পথেঘাটের মানুষগুলোকে দেখলেই যেমন মনে হয়, সবাই অসুস্থ, সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সবাই যেন হতাশায় ভুগছে। এখানকার মানুষগুলো ঠিক তার বিপরীত। এখানকার প্রত্যেকেই যেন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে ; সবাই যেন লড়াই করে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেখে মনে হয়, এরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু হেরে যেতে রাজি না। আমাদের বাড়ির প্রায় উল্টো দিকেই একটা বিশাল তিনতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ওখানে যেসব মিস্ত্রি আর কুলিরা কাজ করছে, তাদের দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কি অসম্ভব হাসিখুশি ওরা। কি অভাবনীয় আনন্দে মিলেমিশে কাজ করে। আর আমাদের কলকাতার বাবুরা সারাদিন ফাঁকি দিয়েই টায়ার্ড! আর হ্যাঁ, এখানে কাউকে আড্ডা দিতেও দেখি না। মোটকথা অনেককিছুই ভাল লাগছে কিন্তু এখানে কি কাকলিদিকে পাবো? তোর মত বন্ধু পাবো? বোধহয় না।

—তোর ঈশিতা

।। তৃতীয় পর্ব।।

প্রিয় পিয়াসা

আমি মৈনাক। আমি জানি, তুমি এই চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবে। আমি স্বীকার করছি, তোমার অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে এই চিঠি লিখতে বসে আমি নিজেও বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তবুও না লিখে পারছি না।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, পুরো তিনটে বছর আমরা এক সঙ্গে কলেজে কাটালাম। তোমার আমার কম্বিনেশন এক হওয়ায় দু'জনে এক সঙ্গে ক্লাস করেছি সকাল থেকে বিকেল। তারপর গোধূলির আবছা আলোয় কলেজের মাঠে বসে কখনও আমরা দু'জনে, কখনও অন্য বন্ধু-বান্ধবীর সাহচর্যে আকাশ-পাতাল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক গল্পগুজব করেছি। মাঝে-মধ্যেই আড্ডা দিয়েছি কফি হাউস বা পুঁটিরামের দোকানে বসে। আবার কখনও কখনও বাল্মীকি বা সাত্যকির পাল্লায় পড়ে তোমার সঙ্গে আমিও সিনেমা-থিয়েটার দেখেছি।

আরো, আরো কত কি আমরা করেছি। এই তিন বছরে বোধহয় তিরিশ দিন বিক্ষোভ মিছিল ধর্মঘট হয়েছে। তোমার মত আমিও কোনদিন কোন রাজনৈতিক ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ার জন্য ঐসব দিন আমরা কয়েকজন কোথাও না কোথাও বেড়াতে চলে গেছি। সারাদিন আনন্দে খুশিতে কাটিয়ে সন্ধের পর বাড়ি ফিরে গেছি। কারণে-অকারণে কখনও একা, কখনও অন্য দু'একজনকে নিয়ে ছুটির দিনে তোমাদের বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোড় করে এসেছি। ইচ্ছে করলে এখনই তোমাদের বাড়ি যেতে পারি বা তোমাকে টেলিফোন করতে পারি কিন্তু তবু কেন তোমাকে চিঠি লিখছি? তিন বছরে কয়েক হাজার ঘণ্টা বক বক করার পরও কি নতুন কিছু বলার থাকতে পারে?

হ্যাঁ, পিয়াসা, অনেক কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছি কিন্তু বলতে পারিনি। সেই কথাগুলো বলব বলেই আজ তোমাকে চিঠি লিখছি।

প্রথম থেকেই শুরু করি।

আমাদের বাড়ির পিছন দিকের বাগানে পিকনিক করার জন্য কলেজের একদল বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে তুমিও এসেছিলে কিন্তু তারপর আর কোনদিন তোমার পক্ষে আমাদের

বাড়িতে আসা সম্ভব হয়নি। আমি জানি, কলকাতার উপকণ্ঠের বেশ কিছু জায়গায় যাতায়াত করা যেমন কষ্টকর তেমনি সময়সাপেক্ষ। আমার জানাশুনা অনেকেই হাসতে হাসতে আমাকে বলেন, তোদের বাড়ি যাবার চাইতে দিল্লী-বোম্বে যাওয়া অনেক সহজ। সে যাইহোক, সেই পিকনিকের দিন মা'র সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। মা'র সঙ্গে আলাপ করে তোমরাও বোধহয় খুশি হয়েছিলে। আমি তোমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে তোমাদের পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেও আমাদের ফ্যমিলি সম্পর্কে তুমি বিশেষ কিছুই জানো না। শুধু জানো, আমি কলেজে ভর্তি হবার পর পরই আমার বাবা মারা যান। তাই তো আমার আসল বক্তব্য জানানোর আগে আমাদের পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আমার ঠাকুর্দার বাবা অবিনাশচন্দ্র অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বি. এ. পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারলেন না। পরদিন ভোরবেলায় উনি সোজা চলে গেলেন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখার্জীর কাছে।

স্যার আশুতোষকে প্রণাম করেই অবিনাশচন্দ্র বললেন, স্যার, এইবারই বি. এ. পরীক্ষা দেব কিন্তু কিছুতেই পরীক্ষার ফি জোগাড় করা সম্ভব হলো না। স্যার, ঐ ফি মুকুব করে দিলে আমি পরীক্ষা দিতে পারি।

স্যার আশুতোষ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন পরীক্ষা দিলে ফল কেমন হবে?

—স্যার, আশা করি ভাল হবে।

—কলেজের পরীক্ষায় কেমন নম্বর পেয়েছিলে?

অবিনাশচন্দ্র মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওঁর হাতে দেন।

কাগজটার উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই স্যার আশুতোষ বললেন, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে এইরকম নম্বর রাখতে পারবে?

—স্যার, এর চাইতেও ভাল করার চেষ্টা করবো।

—ম্যাথমেটিক্সের তিনটে প্রশ্ন দিচ্ছি। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ তিনটে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারো, তাহলে তোমার পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দেব।

পিয়াসা, বিশ্বাস করো, অবিনাশচন্দ্র মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে সঠিক উত্তর লিখে দিয়েছিলেন বলে স্যার আশুতোষ শুধু ওর বি. এ. পরীক্ষার ফি দেননি, নিজের খরচায় এম. এ. পড়িয়েছিলেন। এর পর স্যার আশুতোষের উপদেশমত অবিনাশচন্দ্র ডেপুটির চাকরি প্রত্যাখান করে অধ্যাপনা শুরু করেন। তোমাকে কোনদিন বলিনি, আমার বাবা আর ঠাকুর্দাও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন। আমার ঠাকুর্দা সত্যেন বসু-মেঘনাদ সাহা-জ্ঞান মুখার্জীর সহপাঠী ছিলেন ও স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র

ছিলেন। দু'টি গোল্ড মেডেল নিয়ে এম. এস-সি পাস করার পর ঠাকুর্দাকে প্রফুল্লচন্দ্রই খুলনা জেলার এক কলেজ অধ্যাপনা করতে পাঠান। ঠাকুর্দার অকালমৃত্যুর জন্যই আমার বাবার পক্ষে এম. এ পড়া সম্ভব হলো না। বিধবা মা ও দুটি অবিবাহিতা বোনের দায়-দায়িত্ব বহন করার জন্যই বাবা বি. এ. পাস করার পর পরই স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন।

আমার মা-বাবার বিয়ের কাহিনী শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

ঠাকুর্দা সপরিবারে কাশী গিয়েছেন। রোজ বিকেলের দিকে উনি দশাশ্বমেধ ঘাটে যান ভাগবত পাঠ শুনতে। তারপর সন্ধ্যা-আহ্নিক করে ফিরে আসেন একটু রাত করে। তারপর হঠাৎ একদিন খেয়াল করলেন, ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটের এক নির্জন কোণে বসে পানের-ষোল বছরের একটি মেয়ে বেশ মন দিয়ে কি একটা বই পড়ছে। ভাগবত পাঠ শোনা শেষ হবার পরও দেখলেন, মেয়েটি একাগ্র মনে বইটি পড়ছে। বিকেল সন্ধেয় দশাশ্বমেধ ঘাটে নানা বয়সের নানা মেয়ে-পুরুষকে দেখলেও এই বয়সের কোন মেয়েকে বই পড়তে দেখে ঠাকুর্দা একটু বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

শুধু সেদিন না, পর পর পাঁচ-সাতদিন মেয়েটিকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে বই পড়তে দেখে ঠাকুর্দা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। এগিয়ে যান মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে।

—মা লক্ষ্মী, কি পড়ছো?

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলে, প্রেম রামায়ণ।

—কার লেখা?

—তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' এর সংস্কৃত অনুবাদ।

—কে অনুবাদ করেছেন?

—ওড়িশার এক মহাপণ্ডিত দশরথ কবিচন্দ্র।

—তুমি কি ক'দিন ধরেই এই বইটিই পড়ছো?

—হ্যাঁ।

—তুমি কী সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্রী?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, না, না, আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্রী না। আমি গত মাসেই আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।

মেয়েটি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সংস্কৃত পড়ি বাবার উৎসাহে।

এবার ঠাকুর্দা একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে প্রশ্ন করেন, মা লক্ষ্মীর প্রিয় বিষয় কী?

—অঙ্ক।

—অঙ্ক?

—হ্যাঁ ; অঙ্ক আমার খুব ভাল লাগে।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে কত নম্বর পেয়েছিলে?

—একশ'র মধ্যে একশ'ই পেয়েছিলাম।

—মা লক্ষ্মী, তুমি তো দারুণ মেয়ে!

—না, না, তেমন কিছু না। আমার দাদা আর দিদি আমার চাইতে অনেক ভাল রেজাল্ট করেছে।

—তোমরা কি এখানেই থাকে?

—আমরা কলকাতার বাগবাজারে থাকি। এখানে বেড়াতে এসেছি।

—তোমার বাবা কী করেন?

—বাবা ওকালতি করেন কিন্তু সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্য বাবার প্রাণ।

—তোমার বাবা কি এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই আছেন?

—না, ওরা কেউ এখানে আসেননি।

—তুমি একাই এখানে এসেছ?

—হ্যাঁ।

—একাই ফিরে যাবে?

—যদি দশ-পনের মিনিটের মধ্যে যদি দাদা না আসে, তাহলে একাই ফিরে যাবো।

—তোমরা কোথায় আছো?

—জঙ্গলবাড়ি।

—কাল আবার আসবে?

মেয়েটি এক গাল হাসি হেসে বলে, যে ক'দিন এখানে আছি, রোজই আসবো। এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকতে বা বই পড়তে খুব ভাল লাগে।

মেয়েটি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ভারতবর্ষে আর কোথাও তো এই পরিবেশ, এই দশাশ্বামেধ ঘাট পাওয়া যাবে না।

—ঠিক বলেছ মা লক্ষ্মী।

এইভাবে দু'তিন দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখাশুনা কথাবার্তার পরই ঠাকুর্দা একদিন ওদের জঙ্গলবাড়ির আস্তানায় হাজির হয়ে ঐ মেয়েটির সঙ্গে বাবার বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং ঠিক এক বছর পর ওদের বিয়ে হয়। মা-বাবার বিয়ের তিন মাস পরই আমার ঠাকুর্দা আকস্মিক মৃত্যুর জন্য ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বাবা স্কুল মাস্টারি শুরু করলেন কিন্তু কয়েক মাস পরই বুঝলেন, ঐ সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব। বাবাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করার জন্য মা পাড়ার দু'একটি স্কুলের ছাত্রীকে পড়িয়ে কিছু আয় করা শুরু করলেন। শুধু তাই না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পড়াশুনা শুরু করে বছর পাঁচেকের মধ্যেই ম্যাথমেটিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করলেন।

জানো পিয়াসা, মা বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগেই অনার্সের ছাত্রীদের পড়াতেন।

শিক্ষিকা হিসেবে মা এত সুনাম অর্জন করলেন যে তিন বেলা তাঁকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হতো এবং বাবার চাইতে অনেক বেশি আয় করতেন। মা ঐভাবে আয় না করলে বাবা বোধহয় পিসীদের বিয়েই দিতে পারতেন না!

আমার বাবা বি. এ. পাস করে স্কুল মাস্টারি করলেও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বাবা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই একটা লাল পেন্সিল নিয়ে স্টেটসম্যান পড়তে বসে সব ভুল সংশোধন করতেন ও ভাষার কোন ভুল নজরে পড়লেই সম্পাদককে চিঠি লিখতেন। অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গেই বাবার চিঠিপত্র স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হতো। বাবার আরো একটা নেশা ছিল। উনি কলেজে অধ্যাপনা করার সুযোগ পাননি বলে রবিবার নিয়মিতভাবে পড়ার দু'তিনটি অনার্সের ছাত্রছাত্রী পড়াতেন এবং তার জনে কারুর কাছ থেকে একটা পয়সাও নিতেন না। ঐসব ছাত্রছাত্রীদের মা-বাবারা টাকাকড়ি দিতে এলে বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, আপনাদের টাকাকড়ি নেওয়া দূরের কথা, আমারই আপনাদের টাকা দেওয়া উচিত। হাজার হোক আপনাদের এই ছেলেমেয়েদের জন্যই তো আমি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছি।

এ তো হলো আমাদের বাড়ির একদিকের ছবি। অন্য দিকের কাহিনী বিশেষ সুখের না। খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় পিসির বিয়েতে বাবা বেশি খরচ করতে পারেননি। সামান্যই গহনা দিয়েছিলেন। কোন ফার্নিচার দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বড় পিসির শ্বশুরবাড়ি সেজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মা-বাবাকে শুধু তাদের বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়েই দেননি, বড় পিসিকেও কোনদিন আমাদের বাড়ি আসতে দেন নি।

ছোটপিসিকে বাবা অসম্ভব ভালবাসতেন। অনেক দেখেশুনে ভদ্র পরিবারের এক সুপাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বিধির বিধানে বিয়ের ঠিক দু'বছর পর এক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ছোটপিসি ও ছোট পিসেমশাই মারা যান। এই দুঃসংবাদ পাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়। মা কিভাবে যে বাবাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন, তা একদিন বলব। সে কাহিনী শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

সুস্থ হয়ে বাবা আবার স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেন। এর কয়েক মাস পরই হেড মাস্টার রিটায়ার করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন হেড মাস্টার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে অন্তত পাঁচ বছর পড়াবার অভিজ্ঞতা থাকলে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করা শিক্ষকরাও ঐ পদের জন্য যোগ্য ছিলেন। হেড মাস্টার হবার কোন ইচ্ছা বা মোহ বাবার ছিল না কিন্তু আমি আর মা প্রায় জোর করে বাবাকে দিয়ে আবেদন করালাম।

আবেদন পাঠাবার পরদিনই বাবা হাসতে হাসতে আমাদের বললেন, প্রেসিডেন্ট কিছুতেই আমাকে হেড মাস্টার হতে দেবেন না।

মা অবাক হয়ে বললেন, কেন?

বাবা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, হাজার হোক ভদ্রলোক আই-এ-এস পাস করে এ-ডি-এম হয়েছেন। তারপর সরকারি কৃপায় এখানকার দুটো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। নিজেকে বড় বেশি পণ্ডিত মনে করেন।

—তাতে তোমাক কী হলো?

মা একটু থেমে বলেন, তোমাকে হেড মাস্টার করার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? বাবা আগের মতই চাপা হাসি হেসে বলেন, এ-ডি-এম সাহেব স্কুলের সব অনুষ্ঠানেই বক্তৃতা দেবার সময় হরদম ভুল কোটেশন দেবেনই।

বাবা একটু থেমে বলেন, পাছে ছেলেমেয়েরা ভুল শেখে, তাই বাধ্য হয়েই ঐসব অনুষ্ঠানেই আমি দু'চারবার বলে দিয়েছি, প্রেসিডেন্ট সাহেব যে কোটেশনটা বললেন, সেটা বায়রনের না, সেক্সপিয়ারের।

আমি হাসতে হাসতে বলি, উনি ঐরকম বলেন নাকি?

—হরদম বলেন। কোনটা সেক্সপিয়রের, কোনটা বায়রনের, তা না জেনেই উনি বলবেনই।

বাবা একটু থেমে বলেন, গত বছর উত্তরবঙ্গ ভয়ানক বন্যা হলো। আমরা স্কুল থেকে বন্যাত্রাণের জন্য যে অনুষ্ঠান করলাম, তাতে, উনি অতুলপ্রসাদের 'ওহে পুরজন দাও কিছু ধন প্লাবিতপীড়িত জনে'র দু'তিন লাইন বলেই বললেন, কবিগুরুর এই আবেদন যেন ব্যর্থ না হয়।

মা বললেন, ভদ্রলোক কোটেশন না দিয়েই বক্তৃতা দেন না কেন?

—ভদ্রলোক নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে এমন সব কেলেঙ্কারি করে ফেলেন যে আমি ভুল সংশোধন না করে পারি না।

যাইহোক, বাবা যা সন্দেহ করেছিলেন, ঠিক তাই হলো। ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যান্যরা বাবাকে সুপারিশ করলেও প্রেসিডেন্ট বললেন, উনি ভাল মাস্টার হতে পারেন কিন্তু হেড মাস্টার হবার মত ব্যক্তিত্ব ওঁর নেই। শেষ পর্যন্ত অন্য একজন শিক্ষককে ওরা হেড মাস্টার করেন এবং বাবা সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাফা দেন। সে খবর জানাজানি হবার পরদিনই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ধর্মঘট করে। উপরের ক্লাসের প্রায় তিন-চারশ' ছেলেমেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় বাবাকে সসম্মানে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার জন্য। বাবা ওদের বলেছিলেন, তোমরা শুধু আমার ছাত্রছাত্রী না, আমার সন্তানও। আমি তোমাদের পড়াতে রাজি কিন্তু স্কুল থেকে একটি পয়সাও মাইনে নেবো না। যদি তোমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করতে পারো, তাহলে নিশ্চয়ই আবার স্কুলে গিয়ে যথারীতি তোমাদের পড়াতে শুরু করব।

না, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজি হননি কিন্তু একদিকে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট, অন্যদিকে

অভিভাবকদের চাপে পড়ে এক সপ্তাহ পর ওরা বাবার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর বাবা যেদিন প্রথম স্কুলে যান, সেদিন তিনি ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক আর অধিকাংশ সহকর্মীর কাছ থেকে কি বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

আমার হায়ার সেকেন্ডারীর রেজাল্ট বেরুবার কয়েকদিন আগেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। আমি কথায় কথায় বাবাকে বেরুবার কয়েকদিন আগেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। আমি কথায় কথায় বাবাকে বলেছিলাম, আমি যত ভাল রেজাল্টই করি না কেন, কোন সাধারণ কলেজে ভর্তি হবো।

বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, প্রেসিডেন্সিতে পড়বে না কেন?

—ওখানে বড় বড় অফিসার আর বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে। ওদের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারবো না।

—প্রেসিডেন্সিতে শুধু ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তি হতে পারে। কার বাবা কি করেন বা কত আয় করেন, তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

—কিন্তু...

—না, না, কোন কিন্তু মনের মধ্যে রেখো না।

বাবা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিলেন, তোমাকে শুধু প্রেসিডেন্সিতে পড়লেই হবে না। আমি যেমন কখনও অর্থের জন্য, কখনও সামান্য এ-ডি-এম'এর কাছে অপমানিত হয়েছি, তোমাকে যেন সে ধরনের অপমান সহ্য করতে না হয়।

বাবা একটু হেসে বলেছিলেন, তুই যদি আমার ঐসব অপমানের শোধ না তুলতে পারিস, তাহলে তো আমি মরেও শান্তি পাবো না।

পিয়াসা, বাবার ঐ স্বপ্ন সার্থক করার জন্যই আমি প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলাম এবং সেজন্যই তোমার বন্ধু হবার সৌভাগ্য অর্জন করি।

তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কলেজের নোটিশ বোর্ডে অ্যাডমিশনের লিস্টে তোমার নাম দেখেই বোধহয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। ছন্দা-নন্দা গঙ্গা-যমুনা-কাবেরী বা মৈত্রেয়ী-গায়ত্রী না, পিয়াসা। আঃ! কি সুন্দর নাম।

মনে মনে শত সহস্রবার তোমার নাম আবৃত্তি করেছি। পিয়াসা! পিয়াসা! পিয়াসা!

শুধু কি তাই? আমার মানসপটে তোমার অপরূপা মূর্তি ভেসে উঠেছে। মাথায় একরাশ চুল। চোখে-মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। তাছাড়া দুটো চোখ কি ভীষণ উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত। অষ্টাদশীর রূপ যৌবনের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বোধহয় ভ্রমরের দলও তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারে না।

আরো, আরো কত কি ভেবেছি। ভেবেছি দিনরাত্তির। রাত্রে শুয়ে শুয়ে পড়ার পরও তোমার কথা ভেবেছি। না ভেবে পারিনি। কখনও কখনও মনে হয়েছে বোধয়হ তোমার জন্যই আমি ঘটনাচক্রে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছি। বিধাতা পুরুষের কি কোন ইঙ্গিত আছে এর পিছনে?

এইসব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কখনও কখনও মনে হয়েছে, আচ্ছা, তুমি যদি খুব অহঙ্কারী দাম্ভিক হও? যদি পারিবারিক খ্যাতি-যশ-অর্থের গৌরবে তুমি আমাকে উপেক্ষা করো? যদি আলালের ঘরের দুলালদের সঙ্গেই তুমি মেলামেশা করো? যদি আমাকে উপেক্ষা করো? যদি...

না, না, বেশিক্ষণ এসব ভাবতে পারিনি। কয়েক মুহূর্ত পরেই মনে হয়েছে, পিয়াসা নিশ্চয়ই ভোরের শিশিরের মতই স্নিগ্ধ পবিত্র, বসন্তের মতই উদার, পাহাড়ী ঝর্ণার মত হাসি-খুশি-প্রাণবন্ত।

আরো কি ভেবেছিলাম জানো?

না, না, সেসব আর বলব না। আমার সেসব পাগলামির কথা শুনলে তুমি হাসবে। তবে একটা কথা নিশ্চয়ই বলব। মা-বাবার বেশ কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। কো-এডুকেশন্যাল স্কুলে পড়ার দৌলতে অনেক মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখেছি ও জেনেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী, অনেকেই ভাল কিন্তু প্রেসিডেন্সির নোটিশ বোর্ডে শুধু তোমার নাম দেখে আমি যে চাঞ্চল্য, যে উন্মাদনা, যে স্বপ্ন দেখেছি, তা আর কোনদিন ঘটেনি।

তাছাড়া তুমি তো জানো, আমি একটু লাজুক, একটু ইন্ট্রভার্ট। তাইতো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ থাকলেও আমি কখনই এগিয়ে যেতে পারিনি। ইচ্ছাও হয়নি, মনে তাগিদও বোধ করিনি। তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী কি না জানি না। তবে আমি মনে করি, বিধাতাপুরুষ আমাদের সবার অলক্ষ্যে বসে আমাদের নিয়ে যে খেলাই করুন না কেন, তার বিশেষ কারণ আছে। অকারণে কোন ঘটনাই ঘটে না।

পিয়াসা, কলেজে অ্যাডমিশনের দিনের কথা মনে আছে? তুমি কাউন্টারের সামনে পৌঁছেই পাশ ফিরে আমাকে বললে, প্লিজ, আপনার ডট পেনটা একটু দিন।

ব্যক! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে যেন প্রথম কালবৈশাখীর ঝড় উঠল! কয়েক টুকরো মুহূর্তের জন্য তোমার চোখের উপর চোখ রেখেই আমি কলমটা তোমাকে দিলাম।

কি একটা কাদজে সই করেই তুমি আমার দিকে কলমটা এগিয়ে দিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বললে, ধন্যবাদ!

আমি তোমার দিকে একবার চোখ তুলেই বললাম, আপনি পিয়াসা?

তুমি একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে বললে, হ্যাঁ।

তারপর আমি টাকাকড়ি জমা দিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তুমি আমাকে ডাকলে, শুনুন।

আমি কয়েক পা এগিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতেই তুমি প্রশ্ন করলে, আপনি কি করে জানলেন আমিই পিয়াসা?

বহুকাল আগের বাংলা সিনেমার বোকা বোকা নায়কদের মত আমি এক গাল হাসি হেসে বললাম, আমার মন বলেছে।

তুমি আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে আমাকে ডাকলে। তারপর আমি তোমার কাছে যেতেই তুমি জিজ্ঞেস করলে, কফি খাবেন?

আমি কি জবাব দেব? আমার জবাব দেবার মত অবস্থা ছিল নাকি?

তুমি আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললে, চলুন, কফি হাউসে যাই।

তোমার নির্দেশে, তোমাকে অনুসরণ করে, তোমারই সান্নিধ্যে সেই আমার প্রথম কফি হাউসে যাওয়া। কফি হাউসের কাহিনী বাংলা উপন্যাস আর অসংখ্য পত্র পত্রিকার পাতায় পাতায় ছাপা হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক কফি হাউসে তোমার মুখোমুখি বসে আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম, আমি যৌবনে পদার্পণ করেছি। আমি সাবালক হয়েছি।

তখন কফি হাউসে বিশেষ লোকজন ছিল না। তাই তো আমরা বসতে না বসতেই একজন মধ্যবয়সী ওয়েটার এসে হাজির। তুমি টেবিলের উপর তোমার ব্যাগ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি খাবেন?

—কফি।

—কফি তো খাবোই। আর কি খাবেন বলুন।

—না, না, এখন আর কিছু খাবো না।

তুমি আমাকে কিছু না বলেই ওয়েটারকে বললে, আগে দুটো ফিশ ফ্রাই দিন। তারপর কফি।

ওয়েটার চলে যেতেই তুমি একটু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, সত্যি বলুন তো, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

—কলেজের নোটিশ বোর্ডে আপনার নাম দেখেই মনে হয়েছিল, আপনি নিশ্চয়ই একটু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে হবেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

তুমি সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললে, তখন তো অফিসে অনেক মেয়েই টাকাকড়ি জমা দিতে এসেছিল কিন্তু আমিই যে পিয়াসা, তা বুঝলেন কী করে?

আমি বলতে পারলাম না, পিয়াসা কখনও কখনও মানুষের মধ্যে হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে এবং তখন সে অনেক অভাবনীয় ব্যাপরেই ভাবতে পারে, জানতে পারে। তোমার বুদ্ধিদীপ্ত ঐ ঘনকালো দুটো চোখ আর ঐ মাধুর্যভরা মুখখানা দেখেই আমি স্থির জেনেছিলাম, এ তো আমার স্বপনচারিণী ছাড়া কেউ হতে পারে না।

না, না, এসব কথা শুধু সেদিন না, কোনদিনই তোমাকে বলতে পারিনি। ভবিষ্যতেও পারবো কি না জানি না।

সেদিন শুধু বলেছিলাম, অন্য সব মেয়ে‌‌েদর থেকে আপনাকে এত বেশি আলাদা—মানে স্বতন্ত্র মনে হলো যে...

ঈশ্বরের কৃপায় ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়েটার এসে আমাদের সামনে দুটো ফিশ ফ্রাই রাখতেই আমাকে আর কথাটা শেষ করতে হলো না।

তুমি ফিশ ফ্রাই'এর প্রথম টুকরোটা মুখে দিতে গিয়েও না দিয়ে আমার দিকে মুখ তুলে বললে, আপনি তো আচ্ছা ছেলে! আপনার কি নাম, তাও আমাকে বললেন না?

—সরি! আমার নাম মৈনাক সরকার।

—বাঃ! সুন্দর নাম তো!

তুমি সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন করলে, কে আপনার নাম রেখেছিলেন?

আমি একটু হেসে বলি, আমার মা'র নাম মেনকা। বাবা বলতেন আমি হিমাবত না হলেও তোমার মা তো মেনকা। তাই তোমার নাম রেখেছি মৈনাক।

ফিশ ফ্রাই খেতে খেতেই তুমি আবার একটু হেসে বললে, স্বয়ং ইন্দ্র অন্য সব পর্বতের ডানা ছেঁটে দিতে পারলেও মৈনাক পর্বতের ডানা ছাঁটতে পারেননি।

এক টুকরো ফিশ ফ্রাই মুখে দিতে গিয়েও দিতে পারি না। আমি অবাক হয়ে বলি, আপনি এইসব পৌরাণিক কাহিনীও জানেন?

—এসব আমি ঠাম্মার কৃপায় জেনেছি।

—আপনার ঠাকুমা বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ।

—একদিন আপনার ঠাম্মাকে দেখতে যাবো।

—আজই চলুন না!

তুমি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বললে, শুধু ঠাম্মা কেন, আমার মা আর পিসির সঙ্গেও আপনার আলাপ হবে।

এবার তুমি একটু হেসে বলেছিলে, আমাদের বাড়িতে গেলে আপনার খারাপ লাগবে না।

—না, না, খারাপ লাগবে কেন কিন্তু...

আসলে তোমার মত সহজ-সরলভাবে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কোন মেয়ে

অপরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে, তা আমি ভাবতে পারিনি। পর পর দু'টি সন্তান গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়ে যাবার পর আমার জন্ম। তাই তো আমার মা-বাবা আমার সম্পর্কে সব সময়ই একটু বেশি সতর্ক থেকেছেন। আমি স্কুলে হই-হুল্লোড় করেছি, খেলাধুলা করেছি, নাটকে অভিনয়ও করেছি। বন্ধুদের সঙ্গে দু'একবার দু'চারদিনের জন্য বেড়াতেও গিয়েছি। না, মা-বাবা কোন আপত্তি করেননি। তবু কি যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্য তোমার মত আত্মপ্রত্যয় তখন আমার ছিল না।

আমাকে থামতে দেখেই তুমি সোজাসুজি আমার চোখের পর চোখ রেখে বললে, হাজার হোক আমার তো এক সঙ্গেই পড়াশুনা করবো। তাহলে এত দ্বিধা করছেন কেন?

—না, না, দ্বিধা না.

—একটু দেরি হলে বাড়িতে বাবা-মা চিন্তা করবেন?

আমি একটু হেসে বললাম, না, না, চিন্তা করবেন না।

—তাহলে চলুন। কফি খেয়েই উঠে পড়ি।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওয়েটার বিল নিয়ে হাজির হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে টাকা বের করি। তুমি মাথা নেড়ে বললে, আমি আপনাকে ডেকে আনলাম আর আপনি টাকা দেবেন, তাই কখনও হয়?

শুধু কফি হাউসের বিল না, তোমাদরে বাড়ি যাবার সময়ও তুমি কিছুতেই বাসের টিকিট কাটতে দিলে না।

তারপর তোমাদের বাড়ি পৌঁছেই যিনি দরজা খুলে দিলেন, তুমি দু'হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললে, পিসি আই অ্যাম এ কলেজ গার্ল!

হাসিতে খুশিতে পিসির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তোমার ঐ চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার মা আর ঠাম্মা। তুমি দু'হাত দিয়ে ওদের দু'জরেন গলা এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আবার আগের মতই চিৎকার করে বললে, ঠাম্মা, ফ্রম টু-ডে আই অ্যাম এ কলেজ গার্ল! বি কেয়ারফুল!

আনন্দে গর্বে ওঁরাও এক গাল হাসি হেসে তোমাকে জড়িয়ে আদর করলেন। এতক্ষণ পর তোমার সম্বিৎ ফিরে এলো যে আমি পিছনেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি মুহূর্তের জন্য ফিরে আমাকে দেখেই বললে, ঠাম্মা, এ আমার এক নতুন বন্ধু। আজই আমার সঙ্গে ভর্তি হলো। তোমার কথা শুনেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

এই কথা বলেই তুমি হেসে উঠলে। ঠাম্মাও হাসতে হাসতে বললেন, আমার এই কাঁচা বয়সে যদি ছেলেরা প্রেমে না পড়ে, তাহলে আর কবে পড়বে?

আমি তোমার ঠাম্মাকে প্রমাম করতেই উনি দু'হাত দিয়ে আমরা মুকখানা ধরে কপালে চুমু খেলেন।

তোমাদের মাকে প্রণাম করতেই উনি আমরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে

জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার?

—মৈনাক সরকার।

—বাঃ ভারি সুন্দর নাম।

তোমার মা আমরা হাত ধরে বললেন, ভিতরে এসো।

ড্রইং রুমে না, ঠাম্মার ঘরেই পাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঐ ঘরে ঢুকেই তুমি একজন অত্যন্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের চবি দেখিয়ে বললে, আমার দাই দাই' এর ছবি। হি ওয়াজ মাই ফার্স্ট বয় প্রেন্ড! ইন ফ্যাক্ট হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড।

তোমার ঠাম্মা আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আজ উনি বেঁচে থাকলে যে কি কাণ্ড করতেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

তোমার মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আজ উনি থাকলে বোধহয় আনন্দে পাগল হয়ে যেতেন।

বোধহয় প্রসন্ন বদলাবার জন্যই তুমি বললে, জানো মা, মৈনাক এইট্রি থ্রি মার্কস পেয়েছে। কি দারুণ ভালো ছেলে ভাবতে পারছো?

তোমার ঠাম্মা বললেন, বাঃ! শুনেও আনন্দ হয়।

তোমার মা মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, চোখ-মুখ দেখেই মনে হয়েছে, ও খুব ভাল ছাত্র।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, না, না, মাসিমা, আমি এমন কিছু ভাল ছাত্র না। নেহাত বাবা-মা দু'জনে আমাকে গাইড করেছেন, তাই...

—তোমার বাবা কী করেন?

—স্কুলে পড়ান।

—মা?

—মা স্কুলে চাকরি করেন না কিন্তু বাড়িতেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়ান।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলি, জানেন মাসিমা, আমার বাবা আর ঠাকুর্দাও প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, মাই গড! থ্রি জেনারেশনস্ আপনারা প্রেসিডেন্সির ছাত্র?

ঠাম্মা বললেন, তার মানে তোমার বাবা আর ঠাকুর্দাও খুব ভাল ছাত্র ছিলেন?

—হ্যাঁ, ঠাম্মা, ওঁরা সত্যি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। তবে ওঁদের চাইতেও ভাল ছাত্র ছিলেন ঠাকুর্দার বাবা। উনি বি. এ. পরীক্ষায় এত ভাল রেজাল্টট করেছিলেন স্যার আশুতোষ নিজের টাকায় ওঁকে এম. এ. পড়িয়েছিলেন।

তুমি এবার হাসতে হাসতে বললে, দেখছ ঠাম্মা, তোমার বয় ফ্রেন্ড কোন ফ্যামিলির ছেলে!

উনি হাসতে হাসতে বললেন, দিদি, তুই কি জানিস না, মি আজোবাজে ছেলের সঙ্গে প্রেম করি না?

ঠাম্মার কথায় আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি।

চিঠিটা বেশ দীর্ঘ হয়েছে। আমার আরো অনেক কথা বলার আছে। তাই সেদিনের কথা আর বিশেষ কিছু লিখছি না। শুধু জানই, সেদিন তোমার ঠাম্মা, মা আর পিসিকে দেখে আনন্দে খুশিতে আমার মন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। আসল কথা হচ্ছে বীজ অঙ্কুরিত হবার জন্য গ্রীষ্মের তাপ, বর্ষার জল আর মাঘের হিম হলেই যথেষ্ট কিন্তু ভাল ফুল-ফলের জন্য চাই সার, চাই পরিচর্যা। মানুষও কোন ব্যতিক্রম নয়। দু' মুঠো অন্ন হলেই সে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষায়ন্ত্বদীক্ষায়-আদর্শে উপযুক্ত হতে চাই আরো, আরো অনেক কিছু। চই মাতৃস্নেহ, পিতার ভালবাসা, চাই দাদু-দিদাদের বন্ধুত্ব, পরামর্শ, চাই মমতাময়ী পিসি-মাসী, চাই সুন্দর পরিবেশ। সেদিন তোমাদরে বাড়িতে গিয়ে বুঝেছিলাম, ঈশ্বর অকৃপণভাবে এইসব দুর্লভ সম্পদ তোমাকে দান করেছেন বলেই তুমি এত ভাল হয়েছ। তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী।

পিয়াসা, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আজ ঘরে ঘরে প্রাচুর্যের বন্য কিন্তু সৌন্দর্যের বড় অভাব ; অর্থ আছে কিন্তু উদারতা নেই ; খ্যাতি আছে কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ব নেই। তোমাদের পরিবার নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম। তাই তো গত তিন বছরে কারণে-অকারণে আমি বার বার ছুটে গেছি তোমাদের বাড়ি। ঠাম্মা যেন যেন বিশাল বট-অশ্বত্থ গাছ। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় যেন জীবনের সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়। আর তোমার মা? এমন সিগ্ধ সান্ত পবিত্র মাতৃমূর্তি দেখেই আমি ধন্য হয়েছি। বহু যুগের সাধনার জোরে তুমি অমন মা'র গর্ভে জন্ম নিয়েছ।

পিসি? উনি সত্যিই এক বিস্ময়। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বললেও বোধহয় ওঁকে ঠিক মর্যাদা দেওয়া হয় না। যিনি কোনদিন স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয় না দেখেও এমন মনুষ্যত্বের অধিকারণী হতে পারেন, তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না।

ওদের তুলনায় তোমার বাবাকে আমি খুব কমই দেখেছি। তবু যতটুকু দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে, উনি যেন শরতের এক টুকরো নীল মেঘ। ঠাম্মা, মাসিমা, আর পিসির উপর সব চিন্তা-ভাবনা দায়-দায়িত্ব সর্ম্পণ করে আপন আনন্দে ভাসতে ভাসতে সংসার সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। তাছাড়া কি অসম্ভব প্রাণবন্ত! তোমার সঙ্গে যেভাবে হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখেন, তা দেখে আমি মুগ্ধও হয়েছি, বিস্মিতও হয়েছি।

• কলেজে ক্লাশ শুরু হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবার সেকেন্ড অ্যাটাক হলো ও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিরবিদায় নিলেন। আমরা মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ; সারা পৃতিবীটা অন্ধকারে ডুবে গেল। একবার মনে হয়েছিল, লেখাপড়া ছেড়ে-ছুড়ে যা হোক কিছু করে জীবন কাটিয়ে দেব। তাই তো শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পরও কলেজে গেলাম না। তারপর একদিন মা আমাকে বললেন, আচ্ছা খোকন, কার বাবা-মা চিরকাল বেঁচে থাকয়ে কাউকে না কাউকে তো আগে যেতেই হবে। তোর বাবার বদলে যদি আমি চলে যেতাম, তাহলে তোর বাবা কি বিপদে পড়তেন, তা ভাবতে পারিস?

আমি কোন কথা বলি না। আমি চুপ করে শুয়ে থাকি। মা আমার মাথায় হাত দিতে দিতে বলে যান, উপযুক্ত সন্তানরা মা-বাবার দুঃখ দূর করে, তাঁদের স্বপ্ন সর্থক করে তোলে। লক্ষ্মী খোকন, তোর বাবার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিস না। তুই দশজনের একজন না হলে তো তোর বাবা উপরে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

মা সব শেষে বললেন, তোদের ক্লাসের সব ছেলেমেয়েগুলোই তো অসম্ভব ভাল। ওদের সঙ্গের সারাদিন কাটলে তোর সব হতাশা দূর হয়ে যাবে। লক্ষ্মী বাবা আমার, কাল থেকে নিশ্চয়ই কলেজে যাবি।

—কাল তো রবিবার।

—ঠিক আছে, পরশু তেকেই কলেজে যাস।

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, সারাদিন বাড়িতে বসে না থেকে কাল বরং কোন বন্ধুর বাড়ি ঘুরে আয়। দেখবি, মন অনেক হালকা হয়ে গেছে।

মাকে বলতে পারলাম না, শুধু তোমার বাড়ি ছাড়া আর কোন বন্ধুর বাড়ি চিনি না। মনে মনে ঠিক করলাম, কাল সকালে উঠেই তোমাদের বাড়ি যাবো। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ঠাম্মা, মাসিমা, পিসি আর সর্বোপরি তোমার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাতে পারলে আমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হতে পারতো।

তোমার মনে আছে কি সেদিনের কথা? মনে আছে কি আমার ন্যাড়া মাথা দেখেই তোমরা সবাই চমকে উঠেছিলে? সব কথা শোনার পর মাসিমা বেশ একটু রাগ করেই তোমাকে বলেছিলেন, আচ্ছা, পিয়া, তুই কি ধরনের মেয়ে বল তো? ছেলেটা পনের দিন ধরে কলেজে আসছে না দেখেও একবার মনে হলো না, একটু খোঁজখবর করি? তোরা যে কি ধরনের বন্ধু, তা আমি ভেবে পাই না।

ঠাম্মা পর্যন্ত বললেন, সত্যি দিদি, তুমি মৈনাকের খবর না নিয়ে অন্যায় করেছে। এই চরম বিপদের দিরেন তোমরা দু'চারজন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ওর দুঃখ কতটা লাঘব হতো তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ওদের সামনে তুমি একটি কথাও বলোনি। মাথা নিচু করে বসেছিলে কিন্তু পরে আমি তোমার ঘরে গেলে তুমি দু'টি হাত ধরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলে,

আমার সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো।

সেদিনই সেই মুহূর্ত থেকে সত্যি আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম, তাই না?

পিয়াসা, তুমি তো জানো, আমি অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে। আমাদের সংসারে অভাবও দেখিনি, প্রাচুর্যও দেখিনি। মধ্যমগ্রমের শেষ প্রান্তে গ্রামীণ পরিবেশে আমাদের বাড়ি তুমি দেখেছ। ঠাকুর্দা নিজের কিছু টাকা আর ঠাকুমার গহনা বিক্রি করে ঐ জমি কিনে একখানা পাকা আর একখানা টিনের ঘর তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে পিসিদের বিয়ে দেবার পর বেশ ক'বছর টানাটানির মধ্যে সংসার চালাবার পর বাবার আয় দিয়ে সংসার চলতো আর মা তঁআর পুরো আয় ব্যাঙ্কে জমাতে শুরু পাঁচ বছর পর মা'র সমস্ত গহনা বিক্রি করে আর গচ্ছিত টাকা দিয়ে আমাদের বর্তমান বাড়ি তৈরি হয়।

সব মানুষেরই কিছু বাতিক থাকে। আমার বাবারও বেশ কিছু বাতিক ছিল। স্কুল বন্ধ থাকলে উনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বইপত্তর পড়তেন। তারপর ঠিক আধঘণ্টা ঘুমুতেন কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে একটু পছন্দ করতেন না। তাই তো বাড়িঘর তৈরি হবার পর আমাদের পিছনের বাগানের বড় বড় গাছগুলোর চারপাশ বাঁধানো হলো। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্য সব সময় বাবা ছুটির দিরেন সকাল-দুপুর ঐসব গাছতলাতেই কাটিয়ে দিতেন। রবিবার সকালবেলায় ঐসব গাছতলাতই বসে বাবা ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। বাবা সব সময় বলতেন, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকলে মানুষ শুধু নীরোগ হয় না, উদারও হয়।

আমার বাবার দ্বিতীয় বাতিক ছিল দেশভ্রমণ। বাবার এই দুটি বাতিকই মা ষোল আনা সমর্থন করতেন। তাই তো স্বামী-স্ত্রী এগারো মাস পরিশ্রম করার পর পুরো এক মাস ধরে ঘুরে বেড়াতেন। আমি যখন মাত্র সাত মাসের তখন আমি প্রথম মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যই। আমি একটু বড় হবার পর বাবা আমাকে বলতেন, শুধু স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করে আর দু'চার ঘণ্টা লইব্রেরিতে কাটালেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। দেশভ্রমণ ছাড়া কোন মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

খুব ছোটবেলার কথা আমার মনে নেই। একটু বড় হবার পর থেকে সম্প্রতি কাল পর্যন্ত দেশভ্রমণ করে দেখেছি, ভারতবর্ষ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কোথাও মানুষের মধ্যে হাহাকার হতাশা দেখিনি। দেখিনি, আরো অনেক কিছু। মিছিল, মিটিং, পথ অবরোধ, যত্রতত্র আড্ডা, ফুটপাতে বেকারদের ক্যারাম খেলা, ভিখারি, সরকারি-বেসরকারি অফিস বাড়ির সর্বাঙ্গে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ, ভাঙাচোরা রাস্তা, দুর্গা-কালী-শনিপূজা করে টাকা তোলা ইত্যাদি আরো অনেক কিছু দেখিনি। আমরা এখানে ঠিক উল্টো ছবিটা দেখি। আমার বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের হাতাশা

আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে দেখতে আমি নিজেও অনেক সময় ভবিষ্যত সম্পর্কে দুঃশ্চিন্তা না করে পারিনি। বাবার মৃত্যু আমাকে আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

সত্যি বলছি পিয়াসা, প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবার পর আমি আবার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। এই কলেজের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মধ্য যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস, জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প দেখেছি, তা আমাকে শুধু অনুপ্রাণিত করেনি, ভবিষ্যত সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদীও করেছে। মা-বাবার সঙ্গে দেশভ্রমণ আর তিন বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে জেনেছি, নিষ্ঠবান আর পরিশ্রমী হলে জীবনযুদ্ধ কেউ ব্যর্থ হতে পারে না এবং এর উপর যার উপযুক্ত শিক্ষলাভ করেছে, তদের সম্ভাবনা সীমাহীন। অধ্যাপাক আর তোমাদের মত বন্ধু-বান্ধবীদের সান্নিধ্যেই আমার মত লাজুক, ভীতু ও সর্বোপরি আত্মাশ্বিাসহীন ছেলেরও নবজন্ম ঘটল।

তমি কি জানো, আমার এই নবজন্মের সূত্রপাত কবে হয়?

ফ্রেসার্স পার্টি হবার মাসখানেক পরই ইউনিয়ন থেকে ফার্স্ট ইয়ারের সব ছেলেমেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হলো আরো একটি অনুষ্ঠানে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বলতে হবে, কেন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি। সময় মাত্র দু'মিনিট। মনে পড়ে কি সে অনুষ্ঠানের কথা? মনে আছে কি কে কী বলেছিল? আমি জীবনেও ভুলব না, সেদিনের স্মৃতি।

বাল্মীকি বলেছিল, আমি ভারতবর্ষের যোগাত্যম প্রধনমন্ত্রী হবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করতে এই কলেজে ভর্তি হয়েছি।

ওর মন্তব্যের পর হাততালিতে ফেটে পড়েছিল সারা হল।

ইংলিশ অনার্সে প্রদীপ বলেছিল, আমি আমার স্ত্রীকে তাজমহলের চাইতে অনেক অনেক সুন্দর ও আরো অনেক বড় প্রেমের মন্দির উপহার দিতে চাই বলেই...

কথাটা শেষ করার আগেই সবাই হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

ফিজিক্সের সুদীপ্তা বলেছিল, আমি ভারতবর্ষের মাদাম কুরী হতে চাই।

সাতকি বলেছিল, আমি সারা দুনিয়ার মানুষকে এক ধর্মে দীক্ষিত করতে চাই।

প্রেয়সী চাপা হাসি হেসে বলেছিল, আমি সারাজীবন সবার আদরের স্নেহের প্রাণের প্রেয়সী হয়েই থাকতে চাই বলেই এই কলেজে...

ওর ঐ মন্তব্য শুনে ছেলেদের মধ্যে যেন বোমা বিস্ফোরণ হলো।

বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর পর তুমি বললে, আমি উপযুক্ত নারী হয়ে সবাইকে সুখে শান্তিতে রাখতে চাই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম যে একটি ছেলেমেয়েও বলল না, ভালভাবে লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি চাই, ভাল স্বামী-স্ত্রী চাই, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চাই। যে যাই বলুক,

সবার মধ্যেই একটা স্বপ্নের ইঙ্গিত পেলাম।

আমি ভেবেছিলাম, আমি বলব, ভালভাবে লেখাপড়া শিখে ভাল শিক্ষাব্রতী হতে চাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কি বলেছিলাম, তা কি তোমার মনে আছে? মনে আছে কি আমি বলেছিলাম, আমি সত্যিকার মানুষ হতে চাই? মনে পড়ে কি, আমার এই মন্তব্যের জন্য তুমি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলে?

এই তিন বছরের আরো কত স্মৃতি মনে পড়ছে। সেসব কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবু কিছু কথা না লিখে পারছি না।

তখন আমরা সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছি। এই বছর খানেকের মধ্যেই আমরা কয়েকজন ছেলেমেয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছি। যেদিন একটু তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ হয় কিন্তু অন্য প্রোগ্রাম নেই, সেদিন আমরা কোথাও না কোথাও বসে আড্ডা দিই। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন আমরা পাঁচ ছ'জন কলেজের মাঠে বসেই মশলা মুড়ি খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ সাত্যকি মুড়ি চিবুতে চিবুতে তোমার ঈশিতা আর দেবিকার দিকে তাকিয়ে আধো আধো ভাবে বলল, এক মহাসমস্যায় পড়েছি। কী করবো বলতে পারিস?

তোমরা দু'তিনজন প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করলে, কী আবার সমস্যায় পড়লি?

— ঐ বুড়ী!

— কোন বুড়ী?

— আবার কে? আমার ঠাকুমা।

— সে বুড়ী আবার তোকে কী সমস্যায় ফেললেন?

— সে বুড়ী বলছে আর বেশি দিন বাঁচবে না।

— কিন্তু সমস্যাটা কী?

আমি আর বাল্মীকি মুড়ি খেতে খেতেই একটু কৌতুক মেশানো কৌতূহলের সঙ্গে তোমাদের কথাবার্তা শুনছি।

আবার এক গাল মুড়ি দিয়েই সাত্যকি উদার সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্তভাবে বলল, বুড়ী বলছে আমার বউ না দেখে মরতে পারবে না।

তুমি হাসতে হাসতে বললে, বেশ তো বিয়ে করে নে।

ঈশিতা প্রশ্ন করল, মেয়ে ঠিক হয়েছে?

— পাড়ার সধবা বিধবা কুমারী সবাই আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। ওর কথায় আমরা সবাই হসি।

হাসি থামলে দেবিকা বলল, ভোরবেলায় উঠে যার মুখ আগে দেখবি তাকেই বিয়ে কর।

আমি নাকি মোষের মত ঘুমোই। মা আর দিদি বুঝি শত ডাকাডাকি করেও আমার

ঘুম ভাঙাতে পরে না বলেই তো পটলের মা আমাকে চা দিতে আসে।

সাত্যকি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঐ মহীয়সী মহিলার এক ডাকে আমি লাফ দিয়ে উঠি।

তোমরা কে যেন বললে, ওকেই বিয়ে কর। সি উইল বি ইওর আইডিয়াল ওয়াইফ।

— তা ঠিক। পটলের মা রূপে মাধুরী দক্ষিত, অভীষ্টলাভে মেধা পাটকরের মতই কর্তব্যে অবিচল আর ওর কণ্ঠস্বর শোনার পর মিনি বাসের এয়ার হর্ন কানে এলে মনে হয় কোকিলের ডাক শুনছি।

— ঠাকুমা কি আর কোন মেয়ে দেখেননি?

— শুধু ঠাকুমা কেন, মা-বাবাও তো মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন।

— তবে আর দেরি করছিস কেন? ঝুলে পড়।

— তা ঝুলে পড়তে পারি কিন্তু তোরা যদি আত্মহত্যা করিস?

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, আমরা আত্মহত্যা করব কোন দুঃখে?

— তোরা সবাই যে দিনরাত্তির বলসি, আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস। তুমি বললে, আর কিছু না?

— হ্যাঁরে পিয়াসা, এদের সবার সামনে বলব?

— কী বলবি?

— ঐ যে কাল রাত্তিরে ফোন করে বললি, আমাকে কাছে না পাবার জন্য তুই কিছুতেই ঘুমুতে পারছিস না।

— মারব টেনে এক থাপ্পড়!

— জানিস পিয়াসা, পরশু রাত দেড়টার সময় ফোন করে ঈশিতা ঠিক একই কথা বলেছে।

দেবিকা সঙ্গে সঙ্গে বলল, তার আগের দিন তো আমি ফোন করেছিলাম, তাই নারে সাত্যকি?

— দ্যাটস্ রাইট।

এইসব ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলতে চলতেই তুমি বললে, এক মৈনাক ছাড়া সব ছেলেরাই কারুর না কারুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বাল্মীকি একটু হেসে তোমাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা না হয় প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি কিন্তু তুই কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস?

তুমি তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে বললে, আমি তো তোদের সবার প্রেমের বন্যায় ভেসে গেছি।

বাল্মীকি চিৎকার করে উঠল, মাই গড! তুই যে সুপার দ্রৌপদী হয়ে গেলি!

এই ধরনের আলতু-ফালতু বকবক করা কলেজের ছেলেমেয়েদের ধর্ম এবং এর

কোন গুরুত্ব নেই। তবু বলব, আমার সম্পর্কে সেদিন তুমি যে মন্তব্য করেছিলে, তারজন্য আমি মনে মনে তোমাকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানিয়েছি।

একথা ঠিক যৌবনের শুরুতেই ছেলেমেয়েরা অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখে, প্রেমে পড়ে, অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে, অবাস্তবকে বাস্তব মনে করে। এক কথায় বলা যায়, এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মনে যেন কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে। সমাজ সংসার পরিবারকে ভুলে তারা নিজেরা এক অলীক স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা হয়।

পিয়াসা, আমিও এই স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা হতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। আমি ভীতু, দুর্বল, আত্মকেন্দ্রিক বলেই বোধহয় কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উড়তে সাহস করিনি। আরো কারণ ছিল। যার মা ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে রোজগার করে ছেলেকে পড়াচ্ছেন, তার পক্ষে কি এই ধরনের বিলাসিতা করা উচিত নাকি সম্ভব? তাছাড়া আমি একটু হীনমন্যতায় ভুগতাম। আমি ছাড়া বাড়ি-গাড়ি পারিবারিক ঐতিহ্য কার ছিল না? সবার সঙ্গেই আমাব বন্ধুত্ব-হৃদ্যতা ছিল কিন্তু ভোরের কুয়াশার মত ওদের আভিজাত্যের আবরণ ভেদ করে আমি কিছুতেই খুব সহজ হতে পারতাম না। ব্যতিক্রম ছিলে শুধু তুমি।

আমাদের ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে বাল্মীকি ছিল হিরো। আমন সুপুরুষ ছেলে বোধহয় আমাদের কলেজে আর ছিল না। ওর হাবভাব চালচলন পোশাকের বৈশিষ্ট্যই অনায়াসেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। এর উপর ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। প্রথম যেদিন আমরা সবাই ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে?

ঐ বিশাল বিশাল থামওয়ালা বাড়ির সামনে পৌঁছেই আমরা অবাক হয়েছিলাম আমাদের মধ্যে কে যেন বাল্মীকিকে প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁরে, তোদের বাড়িতে ক'হাজার পায়রা থাকে রে?

বাল্মীকি হাসতে হাসতে বলেছিল, পায়রা তো দূরের কথা, আমাদের বাড়িতে টোটাল কতগুলো লোক থাকে, তাও বোধহয় কেউ বলতে পারবে না।

ভাস্বতী বলল, কেন গুল মারছিস? তোদের বাড়িতে কে কে থাকেন, তা তুই জানিস না তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বাল্মীকি বলল, ভাস্বতী, বিলিভ মি, আমি সত্যি জানি না।

ও বারান্দা দিয়ে মেন ড্রইংরুমের দিকে এগুতে এগুতে বলেছিল, আমার বাবা-কাকারা পাঁচ ভাই ; আমার পাঁচ পিসিও আছেন. এই দশজনের কয়েক শ' আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারা কখন আসছে বা কতদিন থাকছে, তা কেউ জানে না।

কে যেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, হ্যারে বাল্মীকি, তোদের এই বাড়িতে কতগুলো ঘর আছে রে?

— মেন বিল্ডিং'এ ছোট-বড় চল্লিশটা ঘর আছে।

— চল্লিশটা?

বারান্দা পেরিয়ে বিশাল ড্রইংরুমের মধ্যে পা দিয়েই বাল্মীকি বলল, তোরা বিশ্বাস করবি কি না জানি না, আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের পুরো বাড়িটা দেখিনি।

সাত্যকি সিগারেটে টান দিয়েই বলল, কেন গুল মারছিস?

বাল্মীকি হাসতে হাসতে বলল, দ্যাখ, আজ তোকে আমি কি জব্দ করি।

শতখানেক বছরের পুরনো সোফাগুলোতে আমাদের বসতে বলে বাল্মীকি ভিতরে গেল। আমরা কেউই বসতে পারি না। অবাক হয়ে দেখি চারদিক। কি বিশাল বিশাল তিনটে ঝাড় লণ্ঠন। দেয়ালের চারদিকে ফরাসি আর ইংরেজ শিল্পীদের তৈরি বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং. বিবস্ত্রা নারী, স্তন পানরত শিশুকে কোলে নিয়ে বিদেশিনী যুবতী মা, মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান ক্যাসল, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, শীতের সিমলা ছাড়া লর্ড কার্জন!

লর্ড কার্জনের পেন্টিংটা দেখেই বিবেক বলল, এ শালা এখানে এলো কী করে?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাল্মীকি আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, এই শালার মোসাহেবি করেই তো আমার ফোর-ফাদাররা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেন।

আমরা ঘুরে দাঁড়াতেই ও চাপা হাসি হেসে বলল, কার্জন শুধু এই ড্রইংরুমে বসে বাঈজীর নাচ দেখতেন না, আমার ফোর-ফাদারের এক সুন্দরী শালীকে নিয়ে মাঝে মাঝে বারাসতের এক বাগানবাড়িতে বেড়াতেও যেতেন।

সাত্যকি হাসতে হাসতে বলল, লাভলি! লাভলি!

সে যাইহোক সেদিন ঐ ড্রইংরুম থেকে তিনতলায় বাল্মীকির ঘরে যাবার পথে ঐ বাড়ির যতটুকু দেখলাম, তাতেই আমাদের চক্ষু ছানাবড়া। নিচের লম্বা বারান্দা পার হয়ে মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই পাঁচ-সাতজন ঝি-চাকর ছাড়াও তিন-চারজন মহিলাকেও ওঠানামা করতে দেখলাম। ঝি-চাকররা সসম্ভ্রমে এক পাশে সরে দাঁড়ালেও ঐ মহিলাদের মধ্যে একজনও বাল্মীকির সঙ্গে কথা বললেন না বলে আমরা একটু অবাকই হলাম। বাল্মীকিও ওদের উপেক্ষা করেই আমাদের নিয়ে উপরে উঠল।

তিনতলায় উঠেই দেবিকা বাল্মীকিকে জিজ্ঞেস করল, সিঁড়িতে যাদের দেখলাম, তারা কী তোর কাজিন সিস্টার, নাকি দিদি-বৌদি?

বাল্মীকি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, না, না, ওরা আমার কেউ না। ভগবান জানে, কে কোন কাকিমাব আত্মীয়!

শুধু বাড়িটিই না, পরিবারও বিশাল, তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

তিনতলার একেবারে দক্ষিণ দিকের কোণে বাল্মীকির ঘর। শুধু ওর ঘরের সামনে সামনে একটা ছোট ছাদ। ছাদের কোনা দিয়ে লোহর ঘোরানো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

বাল্মীকির ঘরখানা যে কোন সাধারণ বাড়ির অন্তত দু'খানা ঘরের সমান। এক কালে ঘরের দেয়ালে যে সুন্দরী পরীদের ছবি আঁকা ছিল, তা এখন অস্পষ্ট হলেও বেশ বোঝা যায়। ঘরের এক পাশে একটা বিশাল পালঙ্ক। ওর উল্টো দিকে একটা বেশ বড় সেটি আর তিনটে সোফার মাঝখানে শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। এ ছাড়া বুক শেলফ পড়াশুনার টেবিল। দুটো গোদরেজের আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কি। ঘরের লাগোয়া বাথরুমটিও মোটামুটি আমাদের একটা শোবার ঘরের মত। হ্যাঁ, টেলিফোনও আছে, ঐ বাথরুমের পাশে।

কে যেন বাল্মীকিকে প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে, তিনতলায় কেউ থাকেন না?

— তিনতলার এই অংশ বাবার ভাগে পড়েছে। আমার ঘরের পাশের তিনটে ঘর গেস্টদের জন্য রাখা আছে।

ও একটু থেমে একটু হেসে বলল, এখানে আমি প্রেম করলেও কেউ জানতে পারবে না, আবার মরে গেলেও পরের দিন সকালের আগে কেউ টের পাবে না।

ভাস্বতী একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে বলল, রিয়েলি?

বাল্মীকিও একটু হেসে বলল, তুই আজ রাত্তিরটা আমার কাছেই কাটাবি নাকি?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, দুনিয়ার কেউ জানতে পারবে না যে তুই আমার ঘরে আছিস?

ভাস্বতী হাসতে হাসতেই বলল, তোদের এই বাড়িতে রাত কাটাবার আগেই আমি আত্মহত্যা করবো।

ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধ চাকর আর দুটি ঝি আমাদের জন্য লুচি-আলুর দম মণ্ডা-মিঠাই নিয়ে হাজির হওয়ায় ঐ প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানেই বাল্মীকির মা, দুই কাকিমা আর প্রায় আমাদেরই বয়সী তিন-চারজন খুড়তুতো বোন এসে হাজির। আমরা ওর মা-কাকিমাদের প্রণাম করতেই এক কাকিমা হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের দেখতে এলাম।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বললে, আমাদের আর কি দেখবেন? আমরা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ ছেলেমেয়ে।

অন্য এক কাকিমা ভাস্বতী আর দেবিকাকে বললেন, তোমরা কি এইরকম জিনস'এর উপর কুর্তা পরেই কলেজে যাও?

দেবিকা একটু হেসে বলল, আমি তো রেগুলারই এইভাবে কলেজে আসি।

ভাস্বতী বলল, আমি হয় জিনস-কুর্তা, না হয় সালোয়ার-কামিজ পরে কলেজে যাই।

— তোমরা শাড়ি পরো না?

ভাস্বতী বলল, না, না, শাড়ি-টাড়ি পরি না।

— আমাদের বাড়ির মেয়েরা ছেলেদের মত জিনস-টীনস পরে বাইরে বেরুবার

কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

তুমি একটু চাপা হাসি হেসে বললে, কাকিমা, আমরা তো সবই পড়াশুনা শেষ করে চাকরি-বাকরির বাজারে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করবো, তাই এখন থেকেই আমরা সেজন্য তৈরি হচ্ছি।

— বিয়ে-থা' করবে না?

তুমি একটু জোরে হেসে উঠে বললে, হ্যাঁ, কাকিমা, আমরা সবাই বিয়ে করবো ; আমরা কেউই সন্ন্যাসিনী হবো না।

অন্য এক কাকিমা চাপা হাসি হাসতে বললেন, তোমাদের শ্বশুর-শ্বাশুড়ি বা বরেরা যদি আপত্তি করে তাহলে তো তোমরা চাকরি করতে পারবে না।

— সে ধরণের কনজারভেটিভ পরিবারে আমরা বিয়েই করবো না।

— কোথায় বিয়ে হবে, তাও কি তোমরা ঠিক করবে?

— আমরাও ঠিক করতে পারি আবার মা-বাবা ঠিক করার আগে নিশ্চয়ই আমাদের মতামত নেবেন।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাল্মীকির মা পাশ ফিরে ছোট জা'কে বললেন, দ্যাখ ছোট, আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েরা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে, প্লেন চালাচ্ছে, হিল্লী-দিল্লী বিলেত-আমেরিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু দু একশ'ভরি সোনার লোভে এরা কখনই বাপ-জ্যাঠার পছন্দ করা ছেলেকে চোখ বুজে মালা পরিয়ে দেবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তুই তোর বরের কাছে শুনিসনি, একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে খড়গপুর থেকে কম্পুটারি পাস করে ওদের আপিসে আঠার হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে?

এবার উনি একটু হেসে বলেন, ঐ মেয়ে কি কখনও আমাদের এই থামওয়ালা বাড়িতে বউ হয়ে এসে সারাদিন পান-জর্দা চিবুবে?

তুমি সঙ্গে সঙ্গে বললে, ঠিক বলেছেন মাসিমা।

এইসব কথাবার্তার সময় চুপ করে বসে থাকলেও ওরা সবাই চলে যাবার পর পরই বাল্মীকি বলল, কাকিমাদের কথায় তোরা কিছু মনে করিস না। আমার কাকিমারা যেমন বিদ্যের জাহাজ, তেমনই কূপমণ্ডুক।.....

আমি বললাম, কিন্তু মাসিমা'র চিন্তাধারা তো খুবই আধুনিক।

— হ্যাঁ, মা সত্যিই খুব আধুনিক।

বাল্মীকি একটু থেমে বলে, আমাদের চোদ্দ পুরুষের মধ্যে আমার দিদি ছাড়া আর কোন মেয়ে বি.এ. পাস করেনি ; আর তা সম্ভব হয়েছে শুধু মা'র জন্য।

তুমি হাসতে হাসতে বললে, মাসিমা'র যে রুচি আছে, তা তো ওঁর সাজ-পোষাক দেখেই বুঝলাম কিন্তু তোর এক একজন কাকিমা তো এক একটা মোবাইল জুয়েলারি শপ!

বাল্মীকি বলল, ওদের আজকে দেখেই তুই অবাক হলি আর ওরা যখন সেজেগুজে নেমন্তন্ন যায়, তখন দেখলে তো মূর্ছা যাবি।

— হ্যাঁরে, তোদের বাড়ি নিয়েই কী বিমল মিত্তির 'সাহেব-বিবি-গোলাম' লিখেছেন? তোমার কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি।

এর দু'চারদিন পরে আমি তোমাকে বলি, সেদিন বাল্মীকিদের বাড়িতে তুমি অনেক অপ্রিয় সত্য বলেছ।

— বাল্মীকির কাকিমারা ঐসব আলতু-ফালতু কথাবার্তা বলায় আমার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল বলেই দু'চারটে কথা না বলে থাকতে পারিনি। তুমি মুহূর্তের জন্য থেমে বললে, সত্যি কথা বলতে কি, ঐ ভদ্রমহিলাদের দেখে আমার গা ঘিন ঘিন করছিল।

— তোমার কথাবার্তা শুনে বোধহয় বাল্মীকি দুঃখ পেয়েছে।

— দুঃখ পায়নি, অসন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। ওর রূপ গুণ আর আভিজাত্য দেখে তো আমি গলে পড়ব না।

তুমি মুহূর্তের জন্য থেমে বললে, বাল্মীকি যতই আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করুক না কেন, ও কখনই আভিজাত্যের গর্ব বা অহঙ্কারমুক্ত হতে পারে না। ওর চাইতে তোমাকে বা সাত্যকিকে আমার অনেক বেশি কাছের মানুষ মনে হয়।

— সত্যি, সাত্যকির মত হাসি-খুশি দিলদরিয়া ছেলে বোধহয় আমাদের কলেজে আর নেই।

— শুধু তাই না। আমাদের কলেজের ছেলেদের মধ্যে সুমনদা আর সাত্যকিকে ছাড়া আর কাউকে তো অন্যের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি না।

তুমি না থেমেই বললে, শুধু আমি না, সবাই মনে করে সাত্যকি খুবই কাছের মানুষ।

আমি একটু হেসে প্রশ্ন করি, কিন্তু আমাকে কেন অনেক বেশি কাছের মানুষ মনে হয়?

তুমি আমার চোখের পর চোখ রেখে চাপা হাসি হেসে বললে, শুধু আমি না, মা-ঠাম্মাও মনে করেন, ইউ আর টু সিনসিয়ার অ্যাণ্ড অনেস্ট! তাই তো তোমাকে কাছের মানুষ মনে হয়।

হ্যাঁ, পিয়াস, সত্যি আমি সিনসিয়ার অ্যাণ্ড অনেস্ট। আমি সারাজীবন এইরকমই সিনসিয়ার আর অনেস্ট থাকতে চাই। তুমি তো এম. এ. পড়বে কিন্তু আমি কি করবো, তা তো জানি না। যদি আই. আই. এম' এ চান্স পাই, তাহলে অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসেস' এ ঢোকার চেষ্টা করবো। অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে কোথায় কিভাবে থাকব, তা বলতে পারছি না। তবে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তোমাকে আমি ভুলতে পারবো না। তোমাকে আমি চাই, জীবনের প্রতিমুহূর্তের সমস্ত সুখ-দুঃখের অংশীদার হিসেবে, সঙ্গিনী রূপে। আমার এই স্বপ্ন কি সার্থক হবে না?

মৈনাক

।। চতুর্থ পর্ব।।

—আমি শুভময় ; তোমার নাম?

—শিল্পী।

—তোমার নাম?

—জয়।

—তোমার নাম?

—সাগর।

—তোমার নাম?

—রাত্রি।

—তোমার নাম?

—সঞ্জয়।

—আর তুমি?

—পিয়াসা।

প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এইভাবেই আমি পরিচয় করেছিলাম আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেদিন আমরা সবাই একটু উত্তেজিত ছিলাম। এম.এ-এম.এস-সি'তে ভর্তি হলে সব ছেলেমেয়েরাই একটা বিচিত্র আনন্দময় উত্তেজনা অনুভব করে এবং তা বোধহয় খুবই স্বাভাবিক।

আমাদের দাদু-দিদাদের যুগের পাঠশালার লেখাপড়া শুরু করার দিন বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কে. জি'তে ভর্তি হবার জন্য শুধু ছেলেমেয়েদের না, তাদের মা-বাবাকেও ইন্টারভিউয়ের বৈতরণী পার হতে হয়। সেই শুরু। তারপর প্রতি পদক্ষেপে পরীক্ষা দিয়ে এক এক পা এগুতে হয়। মোট কতবার পরীক্ষা দিয়ে যে হায়ার সেকেন্ডারির সিংহদ্বার পেরুতে হয়, তা শুধু ভগবানই জানেন। তিন বছরের কলেজ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি পরীক্ষা ছাড়াও প্রায় সব ভাল ভাল কলেজে উইকলি টেস্ট হয়। মোদ্দা কথা, বেশ কাঠ-খড় পুড়িয়েই ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়।

শুধু তাই নয়। যারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, তারা সবাই যৌবনের সোনার তরীতে

ভেসে চলে বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যও তখন খুব বেশি দূরের মনে হয় না। এর উপর ঝুলিতে থাকে জীবন যৌবন জগত সম্পর্কে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা। তাইতো বিশেষ কোন দ্বিধাসঙ্কোচ ছাড়াই আমরা মেলামেশা শুরু করলাম।

আমাকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে, মাত্র দু'তিন মাসের মধ্যেই আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে হৃদ্যতা-বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, তার বারো আনা কৃতিত্বই সাত্যকির। যৌবনের যে একটা নিজস্ব উদারতা থাকে, তা ওকে দেখেই আমি প্রথম উপলব্ধি করি। মানুষকে আপন করে নেবার ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার।

আমাদের সঙ্গে তিনজন বিবাহিতা মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। ওদের মধ্যে মালা বয়সে সব চাইতে বড় ছিল। বি. এ. পাশ করার পর পরই ওর বিয়ে হয় ; বিয়ের তিন বছর পর ছেলে হয়। সেই ছেলে দু'বছরের হবার পর পরই এম. এ. পড়তে এসেছে। জয়ার বিয়েও হয় বি. এ. পাশ করার পর। ওর স্বামী তখন দুর্গাপুরে ছিলেন বলে ওকেও সেখানে চলে যেতে হয়। স্বামী কলকাতায় বদলী হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আর দীপান্বিতার বিয়ে হয়েছে মাত্র মাস তিনেক আগে। ওর স্বামী কানপুর আই-আই-টি'তে এম. টেক করছে।

ইউনিভার্সিটিতে আসার দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই এইটুকু খবর আমরা সবাই জানতে পেরেছিলাম কিন্তু কবে কার জন্মদিন বা কে কবে বিয়ে করেছে, তা আমরা জানব কেমন করে?

ইউনিভার্সিটিতে মাস দেড়েক ক্লাস করার পরই হঠাৎ সাত্যকি ক্লাসে ঢুকেই মালাকে টিপ করে একটা প্রণাম করেই কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে ফুলের ছোট্ট একটা তোড়া বের করে ওর হাতে দিয়েই চিৎকার করে ওঠে, হ্যাপি বার্থ ডে টু বড় বৌদি!

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে শুধু আমরা না, মালা নিজেও স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিস্ময় কাটার পর মালা একটু হেসে প্রশ্ন করে, তোমাকে কে বলল, আজ আমার জন্মদিন?

সাত্যকি মৌরী চিবুতে চিবুতে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে উত্তর দেয়, তোমার জন্মদিন কবে, তাও কী আমাকে অন্যের কাছে জানতে হবে?

মালা ওকে আবার কিছু প্রশ্ন করার আগেই আমরা সবাই হৈ হৈ করি উঠি। সবারই এক প্রশ্ন, আজ সত্যি কী তোমার জন্মদিন?

মালা কোন কথা বলে না ; শুধু হাসে। তারপর শিল্পী রাত্রি পিয়াসারা ওকে চেপে ধরতেই বলে, হ্যাঁ, আজই আমার জন্মদিন।

বিরাট যৌথ পরিবারেব বড়কর্তার মত সাত্যকি গুরুগম্ভীরভাবে ফতোয়া জারি করল, ক্লাস শেষ হবার কেউ পালিও না। বড় বৌদির অনারে কফি হাউসে পার্টি হবে।

হ্যাঁ, সেদিন সত্যি আমরা ক্লাস শেষ হবার পর চলে যাইনি। সবাই চাঁদা দিয়ে হৈ হৈ করে খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এসেই সাত্যকি দশ টাকার তিনখানা নোট পিয়াসার হাতে দিয়ে বলল, বড় বৌদি তো তোদের ওদিকেই থাকে। তুই, রাত্রি আর শুভময় ট্যাক্সি করে বড় বৌদিকে বাড়িতে পৌঁছে দিবি।

সাত্যকি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে গেল।

সাত্যকির উদ্যোগে সেদিন ঐ পার্টি না হলে এবং তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হৃদ্যতা কখনই গড়ে উঠতো না। সেদিনের পর থেকে ক্লাস শেষ হবার পর আমরা প্রায় সবাই মিলে ঐ ক্লাস রুমে বসেই অন্তত ঘণ্টা খানেক আড্ডা না দিয়ে বাড়ি ফিরতাম না। কোন কোনদিন ইউনিভার্সিটির অন্যান্য সব ক্লাসের ছুটি হবার পরও আমাদের আড্ডা ভাঙতো না। ঐ আড্ডা চলতে চলতেই কেউ হয়তো মীর্জাপুর স্ট্রিট থেকে মুড়ি তেলে ভাজা বা পুঁটিরামের দোকান থেকে নিমকি-সিঙাড়া কিনে আনতো। এইরকমই একদিন আড্ডা দিতে দিতে শিল্পা আর রাত্রির কথাবার্তা শুনে হঠাৎ মালা গেয়ে উঠল—

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে
তোদের মতো মনের কথা কই।...

আমরা হৈ হৈ করে উঠি কিন্তু মালা থামে না। মুখ টিপে হাসতে হাসতে গেয়ে যায়—

ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে বসে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে
চেয়ে বসে রই।...

এইরকম আনন্দে দিনগুলো কাটতে কাটতেই এসে গেল পূজার ছুটি। ছুটি শুরু হবার কয়েক দিন আগে থেকেই ছুটিতে কে কোথায় যাবে, কে কি করবে, তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা।

সাত্যকি মালাকে জিজ্ঞেস করল, বড় বৌদি, ছুটিতে কি তুমি বাইরে কোথাও যাবে?

—শাশুড়ির খুব ইচ্ছা পুরী যাবেন। তাই ঠিক হয়েছে ওখানেই যাওয়া হয়।

—পুরো ছুটিটাই কি ওখানে কাটাবে?

—না, না।

ওর দিকে তাকিয়ে মালা বলে, তোমার দাদার তো মোটে চারদিন ছুটি। ঐ ছুটির সঙ্গে আরো ক'দিন ছুটি নিয়ে আমরা বোধহয় দিন দশেক ওদিকে কাটাবো।

—তারপর?

—তারপর কলকাতাতেই থাকব।

এবার মালা প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় যাবে?

সাত্যকি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলে, এই বুড়ো বয়সে কখনও বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে যেতে ভাল লাগে?

আমরা তিন-চারজন প্রায় একই সঙ্গে বলি, ঠিক বলেছিস।

মালা একটু চাপা হাসি হেসে বলে, তাহলে কি করবে, ঠিক করেছ?

ও আবার সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলে, যদি পিয়াসা, মাধুরী বা রাত্রি আমার সঙ্গে যেতে রাজি থাকে, তাহলে কোন নির্জন...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমরা সবাই হেসে উঠি।

হাসতে হাসতেই রাত্রি প্রশ্ন করে, তুই আমাদের তিনজনকে সামলাতে পারবি?

সাত্যকি গম্ভীর হয়ে বলল, তোদের কি করে সামলাবো, তা কি বড় বৌদির সামনে বলতে পারি?

পিয়াসা চাপা গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, মাধুরী আর রাত্রিকে সঙ্গে নিলে আমি যাচ্ছি না।

—কেন?

—আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার।

—রিয়েলি?

—প্রাণ-মন দিয়ে তিন বছর ধরে তোকে ভালবাসার পরও যদি মাধুরী আর রাত্রির সঙ্গে শেয়ার করতে হয়...

সাত্যকি সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, পিয়াসা, তুই এবার আমার কাছে একটা থাপ্পড় খাবি।

—থাপ্পড় মারবি কেন?

—সুন্দরী, তোর সঙ্গে প্রেম করার জন্য আমরা অন্তত ডজন খানেক ছেলে তোকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটার গিয়েছি, কলকাতা আর আশেপাশের সব রোমান্টিক আর নির্জন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কত প্রেমের উপন্যাস পড়িয়েছি, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি কিন্তু তবু চিড়ে ভেজেনি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে, তুই যেমন কেপ্পন, তেমনি গভীর জলের মাছ।

—আমি কেপ্পন?

—ওরে বাপু, টাকাকড়ির কথা বলছি না। ও তো হাতের ময়লা। তুই একটু উদার হলে আমাকে কত কি দিতে পারিস।

সাত্যকি রোমান্টিক দৃষ্টিতে পিয়াসার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে কথাগুলো বলে।

পিয়াসাও একটু হেসে বলে, আমি আবার তোকে কী দিতে পারি?

—সবার সামনে বলব, তুই কী দিতে পারিস?

—তোকে আমি ঘোড়ার ডিম দিতে পারি।

সাত্যকি হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু পিয়াসা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি, একদিন আমার জন্য তোকে চোখের জল ফেলতে হবে।

সেদিন ঐ আড্ডায় আমরা অনেকেই কথা বলেছিলাম কিন্তু সেসব কথা ভুলে গেছি। ভুলিনি, ভুলতে পারিনি, সাত্যকির কথাগুলো। ওর ঐ কথাগুলো বোধহয় সারাজীবনেও ভুলতে পারবো না ; ভুলতে পারবে না পিয়াসা।

পঞ্চমীর দিন আমার বাবা-মা-দাদা-দিদি-বৌদি পাঁচমারী গেলেন। ঐ দিনই আমার ছোট বোনকে নিয়ে দিদি-জামাইবাবুরা গেলেন শিলং। সপ্তাহ দুয়েক পর ওরা সবাই ফিরে আসার পর সৃঞ্জয় আর কলেজের দুই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আমি চলে গেলাম সিকিম। গ্যাংটক, গেজিং, পেমিয়াং-শি আর পেলিং ঘুরে কলকাতা ফিরলাম দশ দিন পর।

পরের দিন সকালে তখনো আমি ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙলো ছোট বোনের ডাকাডাকিতে।

—এই ছোড়দা, তোর টেলিফোন।

—বল, আমি ঘুমুচ্ছি।

—কিন্তু মালাদি বললেন, খুব জরুরী। এক্ষুণি তোকে ডেকে দিতে বললেন।

আমি চোখ দুটো বড় বড় করে বলি, বললেন, খুব জরুরী?

—হ্যাঁ।

না, আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে টেলিফোন ধরি।

—হ্যালো!

মালা কাঁদতে কাঁদতে বলল, শুভ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলি, তোমার কী হয়েছে?

—না, না, আমার কিছু হয়নি। সাত্যকি নেই।

আমি চমকে উঠি, নেই মানে?

—পরশু ভোরে ও মারা গেছে।

—কী বলছ তুমি?

—তুই এক্ষুণি আমার বাড়ি চলে আয়। তোকে নিয়ে আমি পিয়াসাদের বাড়ি যাবো।

পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে আমি ট্যাক্সিতে মালার বাড়ি রওনা হই।

মালার শাশুড়ি দরজা খুলে আমাকে দেখেই বললেন, এসো, বাবা, এসো।

আমি বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই উনি বললেন, বৌমা বড্ড আঘাত পেয়েছেন। সাত্যকি যেমন পাগলের মত ওকে ভালবাসতো, বৌমাও ঠিক ছোট ভাইয়ের মত ওকে ভালবাসতো। কাল রাত্তিরে খবরটা পাবার পর থেকে শুধুই কাঁদছে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মালাকে দেখে সত্যি আমি চমকে উঠলাম। শোকে

দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যে মানুষের চোখ-মুখের চেহারা যে এমন অদ্ভুতভাবে বদলে যায়, তা এরা আগে কখনো দেখিনি। খোলা চুল এলোমেলো, কপালে সেই পরিচিত সিঁদুরের বিরাট টিপ নেই, শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে পড়ে গেছে। রাত্রি ওর একটা হাত ধরে বসে আছে। মালার স্বামী সিগারেট টানতে টানতে পায়চারি করছেন। সব মিলিয়ে এক অসহনীয় দৃশ্য।

মালার স্বামী সুমন্তদা ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি একটা মোড়া নিয়ে মালার সামনে বসি। ও শুধু শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু কেউই কোন কথা বলি না।

পাঁচ-সাত মিনিট পর মালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা পুরী থেকে আসার পর থেকে দু'তিন দিন পর পরই সাত্যকি আসতো। কিছুক্ষণ আমার ছেলের সঙ্গে হৈ চৈ করে আর আমার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে চলে যেতো। খেতে বললে কখনই খেতো না। সব সময় বলতো, বাবা-মা এখানে নেই। কাজের লোক ছাড়া শুধু পিসিমা বাড়িতে আছেন। আমাকে না খাইয়ে উনি কখনই খাবেন না।

—ওর সঙ্গে তোমার শেষ করে দেখা হয়েছে?

—গত রবিবার।

মালা মুহূর্তের জন্য থেমে একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, ও কখনই বেল বাজাতো না। সব সময় বড় বৌদি বড় বৌদি বলে চিৎকার করতো। রবিবারও ও বেল বাজায়নি কিন্তু ঠিক যেভাবে চিৎকার করে আমাকে ডাকে, সেদিন সেভাবে না ডেকে বেশ আস্তে, আস্তেই ডাকছিল।

—তারপর?

—ওকে দেখেই বুঝলাম, ওর শরীর ভাল নেই। গায় হাত দিয়ে দেখি, বেশ জ্বর। বলল, শরীরের জয়েন্টগুলোতেও বেশ ব্যথা। তাই মনে হচ্ছে, ফ্লু হয়েছে।

—ঐ জ্বর নিয়ে গড়পার থেকে তোমার এখানে এলো কেন?

—হ্যাঁ, আমিও সেকথা বলেছিলাম কিন্তু বলল, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল বলেই চলে এলাম।

—ডাক্তার দেখিয়েছিল?

—ডাক্তার দেখাবার কথা আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে বলল, এ ধরনের জ্বর-গায় ব্যথা তো আমার মাঝে মাঝেই হয় ; তাই এত চিন্তার কিছু নেই।

—তখন ওর বাবা মা কি কলকাতা ছিলেন?

—ওরা ফিরেছেন সোমবার।

মালা একটু থেমে বলে, মেসোমশাই সোমবারই ডাক্তার দেখান। দু'দিনে তিন-চারবার রক্ত পরীক্ষা হয়।...

—তাতে কী ধরা পড়েছিল?

মালা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই কাঁদতে কাঁদতে বলল। লিউকোমিয়া! ব্লাড ক্যান্সার!

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখে মুখে অন্ধকার দেখি। হাজার হাজার লাউড স্পিকারে যেন একটা শব্দই আমার কানে আসে, ক্যান্সার! ক্যান্সার! ক্যান্সার!

বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউই কোন কথা বলতে পারি না। মনে হলো, কোন এক অজানা অশুভ শক্তি আমাদের সবার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে।

পনের বিশ মিনিট পর সুমন্তদা এগিয়ে এসে মালার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সাত্যকির সঙ্গে আমার ক'দিন দেখা হয়েছে! কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে, তখনই এমনভাবে বড়দা বলে ডাকতো যে আমি ভাবতেই পারতাম না, ও আমার ছোট ভাই না।

মালার শাশুড়ি কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ছেলেটা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আমাদের সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরের ছেলে যে এভাবে আপন হয়, তা ভাবা যায়না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, বুঝলে শুভ, আমাদের তিনজনের কথা তো বাদই দিচ্ছি, আমার দাদুভাই পর্যন্ত খেলাধুলা করছে না। ঐটুকু শিশু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, কোন একটা সর্বনাশ হয়েছে।

আমি আর রাত্রি চুপ করে শুনি।

হঠাৎ মালা আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, হতভাগা গত রবিবার চলে যাবার সময় আমাকে কী বলেছিল জানিস?

আমি মুখে কিছু না বলে শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাই।

—দরজায় দাঁড়িয়ে ও একটু হেসে আমাকে বলল, বড় বৌদি, আমার খুব ইচ্ছে, আমি আগামী জন্মে যেন তোমার ছেলে হয়ে জন্মাই আর পিয়াসাকে যেন বিয়ে করতে পারি। আমি ওকে বলতে পারি না কিন্তু তোমাকে বলছি, আমার চাইতে কেউ ওকে বেশি ভালবাসতে পারবে না। পিয়াসা ইজ রিয়েলি এ পিস্ অব ড্রিম!

কথাটা শুনে আমি আমার মনের মধ্যেই মনের ভাব চেপে রাখি। ভাল-মন্দ কিছুই মন্তব্য করি না।

বালিশের তলা থেকে একটা ডায়েরি বের করে আমাকে দেখিয়ে বলে, এটা সাত্যকির ডায়েরি। কাল ওদের বাড়িতে যেতেই ওর বাবা এটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে শুধু তোমাদের কথাই লেখা আছে। এটা তুমিই রেখে দিও।

আমি জিজ্ঞেস করি, এই ডায়েরিতে কি বন্ধুবান্ধবদের কথা লেখা আছে?

ও ডায়েরিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, একবার চোখ বুলিয়ে দ্যাখ।

ডায়েরিটা উল্টে প্রথম পাতাতেই দেখি সাত্যকি লিখেছে—যে যাই বলুক, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ঐতিহাসিক দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং'এ ক্লাস করার রোমাঞ্চই আলাদা। অনেক ভাগ্য করে ছাত্রছাত্রীদের ওখানে পৌঁছতে হয় এবং নিশ্চয়ই স্মরণীয়ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। আজই প্রথম দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং'এ ক্লাস করলাম এবং আমার জীবনের অন্যতম পবিত্র দিন। তার কারণ মালা।

মালাকে দেখেই মনে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে ওকে প্রণাম করি, বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলি, মা! মা! মা!

কিন্তু না, পারলাম না। ভয় হলো, ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরা মনে করবে, আমি ন্যাকামি করছি, নাটক করছি। আমি ওদের বলতে পারব না, তোমরা বিশ্বাস করো, মালাকে দেখেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভালবাসায় আমার মন ভরে গেছে। ওকে আমি মা ছাড়া আর কোনভাবেই ভাবতে পারছি না। এমন অপূর্ব মাতৃমূর্তিকেও যদি প্রাণভরে মা বলে ডাকতে না পারি, তাহলে বেঁচে আছি কেন?

মালা, তোমাকে বড় বৌদি বলে ডাকলেও আমি কিন্তু তোমাকে মা বলেই মনে মনে পূজা করবো। মা, মাগো, তুমি অন্তত আগামী জন্মে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দিও।

ঐ প্রথম পাতাটা পড়ে মুখ তুলতেই রাত্রি একটু ম্লান হাসি হেসে আমাকে বলল, দেখছিস, সাত্যকি কি রকম পাগলের মত মালাদিকে ভালবাসতো?

ও একটু থেমেই বলল, প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই ও মালাদিকে নিয়ে এইরকম কত কি লিখেছে, তা দেখে তুই অবাক হয়ে যাবি। আমরা জানতাম, ও মালাদিকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু এই ডায়েরি পড়ে জানলাম, ও কত গভীরভাবে, কত সিনসিয়ারলি মালাদিকে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো।

—তুই পুরো ডায়েরিটা পড়েছিস?

—হ্যাঁ।

—মালাদি ছাড়া আর কাকে নিয়ে কী লিখেছে?

রাত্রি আমার হাত থেকে ডায়েরিটা নিয়ে দু'চারটে পাতা উল্টে-পাল্টেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, তাহলে শোন, দু'চারটে পড়ে শোনাচ্ছি।...

ও ডায়েরির দু'এক পাতা উল্টিয়েই বলে—বৃহস্পতিবার : রাত ১-৪০ মিঃ।

—পিয়াসা; তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।...

—রবিবার : দুপুর ৩ টা ১০ মিনিট।

—পিয়াসা, এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল।

রাত ১২ টা ৫ মি:

—পিয়াসা,

খোলো খোলো দ্বার,
রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।

মঙ্গলবার ।। ভোর ৫ টা ১৫ মিনিট।।

—পিয়াসা,

আমার পরান যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো।

এই কয়েক দিনের টুকরো টুকরো লেখা পড়েই রাত্রি ডায়েরিটা বন্ধ করে বলল, মালাদি ছাড়া প্রায় সারা ডায়েরিটায় পিয়াসাকেই নিয়েই লেখা রয়েছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, পিয়াসা এই ডায়েরি দেখেছে?

একবার নিঃশ্বাস নিয়েই ও আবার বলল, কাল দুপুরে খবরটা পাবার পরই তো আমি আর পিয়াসা এক সঙ্গে সাত্যকিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর সামনেই তো মেসোমশাই ডায়েরিটা আমাকে দিয়েছিলেন। তারপর ওখান থেকে ফিরে এসেই আমরা দু'জনে মিলে ডায়েরি পড়েছি আর দু'জনেই কেঁদেছি।

আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মালা আর রাত্রির অনুরোধে ওদের সঙ্গে পিয়াসাদের বাড়ি গেলাম। দেখলাম, সাত্যকির এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ওকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, প্রেসিডেন্সিতে কত ছেলের সঙ্গেই তো বন্ধুত্ব হয়েছিল কিন্তু সাত্যকির মত উদার ছেলে দেখিনি। ও যেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারতো, সেইরকমই মন প্রাণ দিয়ে সবাইকে ভালবাসতো কিন্তু হতভাগা যে মনে মনে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো, তা তো জানতেও পারিনি, ভাবতেও পারিনি।

যাইহোক, এ তো গেল সাত্যকির কথা। এবার একটু নিজের কথা বলি।

আমার বাবা এখন প্রাইভেট প্রাকটিশ করলেও দীর্ঘদিন সরকারি চাকরি করেছেন। ন্যাশনাল মেজিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর পরই বাবা সরকারি চাকরি নিয়ে চলে যান বিষ্ণুপুর। আমার যখন জন্ম হয়, বাবা তখন শ্রীরামপুর পোস্টেড। আমার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন বাবা বদলি হলেন কাটোয়া হাসপাতালে। বাবা ওখানে ছিলেন ঠিক তিন বছর।

আমার বেশ মনে আছে, আমাদের ঠিক পাশের কোয়ার্টারে যে ডাক্তার কাকু থাকতেন, তিনি আর বাবা একই সঙ্গে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেন। ঐ ডাক্তারকাকু বাবার বিয়েতে বরযাত্রীও গিয়েছিলেন। তাই তো দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। ওদের মেয়ে মিতুও আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল।

মিতু আমারই সমবয়সী ছিল। আমরা দু'জনে সারাদিন এক সঙ্গে কাটাতাম। কে

কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। সপ্তাহে দু'একদিন তো আমরা একসঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে ঘুমুতাম কখনও আমাদের কোয়ার্টারে, কখনও ওদের কোয়ার্টারে।

ঐ হাসপাতালেরই এক প্রবীণ ডাক্তারের মেয়ের বিয়েতে আমাদের সবারই নেমন্তন্ন ছিল। ঐ বিয়ে দেখে আসার পরদিনই মা-কাকিমার সামনেই মিতু দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ছুভো, তুই আমার বর, আমি তোর বউ ; কেমন?

সে কথায় মা-কাকিমার কি হাসি! বাবা আর ডাক্তারকাকু হাসপাতাল থেকে আসার পর তাঁদের কানেও মিতুর ঐ বৈপ্লবিক ঘোষণার কথা পৌঁছে গেল। অন্যান্য ডাক্তারদের বাড়িতেও কথাটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না।

এর পর কেউ আমাদের কোয়ার্টারে এলেই হাসতে হাসতে মা'কে জিজ্ঞেস করতেন, ছেলে-পুত্রবধূর খবর কী?

আবার কাকিমার সঙ্গে দেখা হলে ওরা প্রশ্ন করতেন, মেয়ে-জামাইয়ের খবর কী?

সে যাইহোক, এই মিতু হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম বান্ধবী! গার্ল ফ্রেন্ড!

তখন বুঝিনি কিন্তু পরবর্তী কালে বুঝেছি, সব মেয়ের মধ্যেই শুধু মাতৃত্ব না, প্রেয়সী হবার বাসনাও লুকিয়ে থাকে ; জয় করতে চায় পুরুষের মন, পুরুষের ভালবাসা। আমরা সবাই জানি, শুধু নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই না, পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই মেয়েরা রূপচর্চা করে। যে নারীর রূপলাবণ্য কোন না কোন পুরুষের মন ব্যাকুল করে না বা নিদেনপক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, তার তো জীবনই বৃথা।

খুব ছোটবেলায় কয়েক বছর শিলিগুড়ি আর আসানসোলে পড়াশুনা করলেও পরবর্তীকালে বরাবরই কলকাতার কো-এড স্কুল ও কলেজে পড়েছি। হেসেছি খেলেছি মিশেছি বহু মেয়ের সঙ্গে। কি জানি কি এক অজানা কারণে বেশ কয়েকটি মেয়ে আমাকে ভালবেসেছে এবং অন্তত দু'জন মেয়ে আমাকে নিয়ে ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্নও দেখেছে।

সবার আগে মনে পড়ছে ঐন্দ্রিলাকে।

আমাদের স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসের এক একটা সেকশানে চল্লিশটি ছেলেমেয়ে ছিল এবং ছেলে-মেয়েরা প্রায় সমান সমান ছিল। কিছু কিছু মেয়ে ছিল যারা ছেলেদের সঙ্গে মামুলি কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা করলেও কখনই বন্ধুত্ব করতো না। আবার কিছু মেয়ে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে প্রায় সব ব্যাপারেই ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতো ; ঐন্দ্রিলা এদেরই একজন ছিল।

ঐন্দ্রিলা ফার্স্ট-সেকেন্ড স্ট্যান্ড না করলেও লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলতো। থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে ভারতনাট্যম শিখতো। প্রত্যেক বছর স্কুলের অ্যানুয়াল ডে'তে ও নাচ দেখাতো। এর উপর ও ছিল সুন্দরী ও বড়লোক মা-বাবার আদুরে মেয়ে।

ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়ার সময়ই ঐন্দ্রিলার হাব-ভাব চাল-চলন দেখে স্কুলের এক

দল ছেলে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করে। তারপর একদিন টিফিনের সময় হঠাৎ সবার সামনেই ঐন্দ্রিলা বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, কাল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে তোর প্রেমপত্র পেলাম।

প্রেমপত্র? লাভ লেটার? শুনে আমরা তাজ্জব। বিপ্লব অপ্রস্তুত।

ঐন্দ্রিলা নির্বিকারভাবে বলে যায়, তুই তো দারুণ রোমান্টিক অ্যান্ড পোয়েটিক অ্যাজ ওয়েল।

দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে প্রায় একই সঙ্গে ঐন্দ্রিলা'ক প্রশ্ন করল, বিপ্লব কী লিখেছে রে?

ঐন্দ্রিলা তির্যক দৃষ্টিতে একবার বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে ওদের বলল, লিখেছে, আমাকে দারুণ ভালবাসে, দিনরাত আমার কথা ভাবে, রাত্রে ঘুম আসে না—এইসব আর কি!

এই ঘটনার পর বিপ্লব তিন-চারদিন স্কুলেই এলো না। তারপর যেদিন ও স্কুলে এলো, সেদিন তিন-চারজন ছেলেমেয়ে ঐ প্রেমপত্র লেখার জন্য বিপ্লবকে বিদ্রূপ করতেই ঐন্দ্রিলা রেগে লাল—তোরা কেন ওকে বিরক্ত করছিস? ও প্রেমপত্র তো আমাকে লিখেছে ; তাতে তোদের কী? দু'দিন আগে বা পরে সবাই প্রেমপত্র লেখে।

বিদ্যুৎ একটু হেসে বলল, ক্যাট ইজ আউট অব দ্য ব্যাগ! তার মানে ঐন্দ্রিলাও বিপ্লবের প্রেমে পড়েছে।

ঐন্দ্রিলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, দ্যাখ বিদ্যুৎ, আমি যার প্রেমেই পড়ি না কেন, অন্তত তোর প্রেমে পড়ার মত ক্যাবলা মেয়ে না।

ঐ ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ই ঐন্দ্রিলা স্কুলের অ্যানুয়াল ডে'র অনুষ্ঠানে নাচে। সেদিনের কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ও বাড়ি থেকে মেক-আপ করে এসেছিল মা'র সঙ্গে। কি কারণে যেন আমি স্টেজের পিছনে গিয়ে ওকে দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম, অবাকও হয়েছিলাম। আমি কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বললাম, ঐন্দ্রিলা, ইউ লুক সো চার্মিং, সো হিপনোটাইজিং...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও একটু হেসে বলল, শুভ, রিয়েলি ইউ মিন ইট?

—সত্যি বলছি, তোকে দারুণ দেখাচ্ছে।

এবার ও আমাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল, গরদের ধুতি-পাঞ্জাবিতে তোকেও তো দারুণ দেখাচ্ছে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, ঠিক মনে হচ্ছে বিয়ের বর!

না, এইখানেই ও থেমে যায়নি। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, কীরে, মালা বদল করবি নাকি?

ওর কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। সলজ্জ হাসি হেসে একবার ওর দিকে তাকিয়েই

স্টেজের বাইরে চলে আসি।

এর ঠিক চার বছর পরের কথা। আমরা ক্লাস ইলেভেন'এ পড়ি।

হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায় ঐন্দ্রিলা আমাদের বাড়ি এসে হাজির। মা ওকে দেখেই বললেন, তুমি আসবে, তা তো শুভ আমাকে বলেনি।

—মাসিমা, ও জানে না। আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম।

—ভালই করেছ।

মা একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, কী খাবে বলো? লুচি নাকি...

মা'কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলে, না, না, মাসিমা, আমি কিছু খাবো না। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

ও একটু থেমে বলল, সামনের ষোলই জানুয়ারি দিদির বিয়ে। আমার অনেক জায়গায় যেতে হবে।

ঐন্দ্রিলা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আমাকে নিয়ে আমার ঘরে এসেই নেমন্তন্নর কার্ড দিয়ে বলল, তুই কিন্তু সন্ধের আগেই এসে যাবি।

—ক্লাসের সবাইকেই নেমন্তন্ন করছিস?

—আমার নাচের ক্লাসের বারো জন মেয়েকেই নেমন্তন্ন করেছি। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে শুধু তোকেই বলছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, শুধু আমাকে কেন?

ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল, বিকজ আই লাইক ইউ, আই লাভ ইউ।

ষোলই জানুয়ারি সন্ধের আগেই আমি বিয়ে বাড়িতে হাজির হলাম। ঐন্দ্রিলা ওর মা-মাসিদের সামনেই আমাকে বলল, তুই সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।

হ্যাঁ, বরযাত্রীদের দেখাশুনা খাওয়া-দাওয়া, বিয়ের আসর ও বাসর ঘরের নানা কিছু সামলানোর সময় আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছি ও সাহায্য করেছি। তারপর প্রায় মাঝরাত্তিরে বাড়ির লোকজনদের খাওয়া-দাওয়া সময়ও ঐন্দ্রিলা আমাকে পাশে নিয়ে বসল। খেতে খেতেই হঠাৎ একবার কানে কানে বলল, দিদির বিয়ে হয়ে গেল ; এবার আমার লাইন ক্লিয়ার। বি. এ. পাস করেই আমরা বিয়ে করবো, কেমন?

আমি কী বলবো? ওর দিকে তাকিয়ে হাসি।

—হাসছিস কেন? দেখে নিস, যা বললাম, ঠিক তাই করবো।

ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের চাইতে ঐন্দ্রিলা যে আমাকে বেশি পছন্দ করে, তার প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি কিন্তু ও যে সত্যি সত্যিই আমাকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, তা জেনে অবাক হয়ে গেলাম। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব উন-যৌবনা মেয়েই কী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে? ষোড়শী-সপ্তদশী-অষ্টাদশীরা বহু উপন্যাসের নায়িকা হয়েছে কিন্তু ষোল সতের আঠোরো বছরের ছেলেরা কখনই নায়ক হয় না। হবে কী করে? প্রকৃতির

কৃপায় ষোড়শী যে ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়, পুরুষকে সে ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে আরো অনেক দিন ধৈর্য ধরতে হয়।

সে যাইহোক, ঘটনাটা আমাকে রোমাঞ্চিত করলেও ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার মত মন ছিল না। আমার বাবা ডাক্তার হলেও অধ্যাপক দাদুর অনুপ্রেরণায় আমি খুব অল্প বয়স থেকেই অধ্যাপনা করার স্বপ্ন দেখেছি। একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর বার বার মনে হয়েছে, আমাকে ভালভাবে হায়ার সেকেন্ডারি-বি. এ.-এম. এ. পাস করে রিসার্চ করতে হবে। বিয়ে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো কিন্তু তার আগে আমাকে দাদুর মত অধ্যাপক হতেই হবে। ঐন্দ্রিলার ভাবাবেগে ভেসে গেলে চলবে না।

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে হবার তিন মাসের মধ্যেই ওর বাবা বদলি হলেন বোম্বে। তার এক মাসের মধ্যেই উনি বদলি হলেন সিঙ্গাপুর। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ হবার পরদিনই ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে ওর মা সিঙ্গাপুর চলে গেলেন।

প্রথম দু'তিন মাস দু'চারটে পিকচার পোস্টকার্ডের পিছনে ঐন্দ্রিলা দু'এক লাইনের চিঠি লিখে পাঠালেও তারপর আর বিশেষ যোগাযোগ করতো না। বছর খানেক পর আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম কিন্তু তার উত্তরে এলো আবার একটা পিকচার পোস্টকার্ড। পিছনে লেখা—থ্যাঙ্কস ফর রিমেমবারিং!

আমার বি. এ. পরীক্ষা শেষ হবার সপ্তাহখানেক পরই হঠাৎ একদিন সকালে ঐন্দ্রিলার মা আমাদের বাড়ি এসে হাজির। উনি এক গাল হাসি হেসে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বান্ধবীর বিয়ে। তুমি গেলে ও খুব খুশি হবে।

—মাসিমা, বিয়ে কি এখানেই হবে?

—না, না, এখানে না। বিয়ে সিঙ্গাপুরেই হবে। ছেলেও তো ওখানেই থাকে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, সন্দীপ তোমাদের মেসোমশাইদের কোম্পানিতেই এঞ্জিনিয়ার। দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। দেখতেও ঠিক রাজপুত্তুরের মত।

আমার মা মাসিমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আত্মীয়-স্বজনের নেমন্তন্ন করার জন্যই কলকাতা এসেছেন?

মাসিমা খুশির হাসি হেসে বললেন, সন্দীপের বাবা-মা তো দিল্লিতে থাকেন। তাই ওদের নেমন্তন্ন করার আমরা স্বামী-স্ত্রী মেয়েকে নিয়েই দিল্লি গিয়েছিলাম।

উনি এক নিঃশ্বাসেই বলে যান, ওরা দু'জনে দিল্লি থেকেই ব্যাংকক হয়ে সিঙ্গাপুর চলে গেল আর আমি সপ্তাহ খানেকের জন্য এখানে এলাম বলে...

মা একটু হেসে বললেন. তার মানে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশুনা করা সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের নেমন্তন্নটাও সেরে নিচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

মা আবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, ছেলেটিকে কি আপনার স্বামীই পছন্দ করেছেন?

মাসিমা আবার এক গাল হাসি হেসে বলেন, সে আর বলবেন না! ইন্ডিয়ান হাই কমিশনের ফাংশানে মেয়ের নাচ দেখে সন্দীপ মুগ্ধ, আবার সন্দীপকে দেখে আমার মেয়েও মুগ্ধ। একেবারে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট!

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি বললাম, মাসিমা, আজকের যুগে এটাই তো স্বাভাবিক।

—নিশ্চয়ই স্বাভাবিক।

উনি না থেমেই বলে, তবে সন্দীপের মত গুণী ছেলেকে পছন্দ করেছে বলে আমরা যেমন খুশি সেইরকমই নিশ্চিন্ত।

প্রথম যৌবনে সব মেয়েই প্রেমে পড়ে ও বোকা মেয়েরা প্রেমে পড়েই বিয়ে করে। বুদ্ধিমতী মেয়েরা বোধহয় নিছক চিত্ত বিনোদনের জন্যই প্রেমে পড়ে কিন্তু পাকা চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্টের মত অনেক হিসেব-নিকেশ করেই নতুন অতিথিতে দেহ-মন সমর্পন করতে স্বীকৃতি জানায়।

বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠিটা হাতে পাবার পর তাৎক্ষনিকভাবে একটু দুঃখ পেলেও নারী চরিত্র সম্পর্কে আমাকে অভিজ্ঞ ও সচেতন কবার জন্য ঐন্দ্রিলার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বি.এ. পড়ার সময়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে লিপির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

সেবার আমার ছোট বোন বুলবুলের পর পর দু'বার টায়ফায়েড হয়। বাবার বন্ধু ও আমাদের পারিবারিক চিকিৎসা মানসকাকু মা-বাবাকে বললেন, তোমরা অতন্ত মাস দুয়েকের জন্য বুলবুলকে নিয়ে কোন হিল স্টেশানে চলে যাও. এই গরমে কলকাতায় থাকলে ওর শরীর কবে ভাল হবে, তা ভগবানই জানেন।

বাবা বললেন, আমিও যে সে কথা ভাবনি, তা নয় কিন্তু পাঁচ দশ দিনের জন্য কোথাও গেলে তো মেয়েটার কোন উপকার হবে না বলেই....

বাবাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মানসকাকু বললেন, আমি জানি, তোমার পক্ষে পাঁচ দশ দিনের জন্যও বাইরে যাওয়া খুবই কঠিন কিন্তু বুলবুলের শরীরের যা অবস্থা তাতে ওকে বেশ কিছুদিনের জন্য বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখা খুবই দরকার.

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যত অসুবিধেই হোক, আমি নিশ্চয়ই বুলবুলকে নিয়ে কোন হিল স্টেশনে যাবার ব্যবস্থা করছি।

মা-বাবা আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলেন, বুলবুলকে নিয়ে নৈনিতাল রাণীক্ষেত বা সিমলা-মুসৌরীর মত দূরের কোন জায়গায় যাওয়া হবে না। ওকে নিয়ে যেতে হবে কার্শিয়াং-দার্জিলিং। তা না হলে বাবার পক্ষেও মাঝে মধ্যে দু'চারদিনের জন্য

ঘুরে আসা সম্ভব হবে না।

দু'চারদিন এদিক ওদিক খোঁজখবর করে যখন জানা গেল, কোন কারনেই সপ্তাহ খানেকের বেশি সরকারী বাংলোয় কোন ঘর পাওয়া সম্ভব না, তখন ঠিক হলো, দার্জিলিং এর কোন হোটেলে ঘর ভাড়া করেই থাকা হবে। পরের দিনই টেলিফোনে ম্যালের লাগোয়া নেহেরু রোডের একটা হোটেলে ঘর বুক করাও হয়ে গেল।

সবকিছু ঠিকঠাক হবার তিনদিনের মধ্যেই আমরা সবাই মিলে দার্জিলিং গেলাম। হোটেলে বুলবুলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সং বিধি-ব্যবস্থা করে বাবা দু'দিন পরই কলকাতা ফিরে গেলেন।

প্রথম সপ্তাহ খানেক বুলবুলকে নিয়ে সারা দিনবাত্তির হোটেলের ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া হলো। তারপর বুলবুলই মাকে বলল, সারাদিন শুধু গল্পের বই পড়ে আর গান শুনে যেন সময় কাটছে না। বিকেলের দিকে ম্যালে গিয়ে বসে থাকলেও সময়টা বেশ কেটে যাবে।

মা বললেন, কাল সকালে ক্যাপ্টেন ঘোষাল তোকে দেখতে এলে জিজ্ঞেস করবো। যদি উনি আপত্তি না করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তোকে ম্যালে নিয়ে যাবো।

পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন ঘোষাল বুলবুলকে দেখেশুনে এক গাল হেসে বললেন, দু'এক ঘণ্টার জন্য নিশ্চয়ই বাইরে যেতে পারো ; তবে দেখো, ঠাণ্ডা না লাগে।

সেদিন বিকেলে মা আর বুলবুলকে ম্যালের একটা বেঞ্চে বসিয়ে আমি একটু ঘুরতে গেলাম। হিমালয়ান মাউন্টোনিয়ারিং ইনিষ্টি টিউটের ওদিক থেকে এক চক্কর ঘুরে এসে দেখি, মা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে জামিয়ে গল্প করছেন আর বুলবুল একটা মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

আমাকে দেখেই মা ঐ ভদ্রমহিলাকে বললেন, আমার ছেলে শুভ।

এবার মা এক গাল হাসি হেসে আমাকে বললেন, শিউলি আমার খুব পুরনো বন্ধু। প্রায় পঁচিশ বছর পর ওকে এখানে দেখে তো আমি অবাক হয়ে গেছি।

মা মুহূর্তের জন্য না থেমেই একটু ঘাড় ঘুরিয়ে বুলবুলের পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, আর ও হচ্ছে শিউলির মেয়ে লিপি।

শিউলি মাসীমা আমার দিকে তাকিয়েই মা'কে বললেন, তোর দুটো ছেলেমেয়েই দারুণ সুন্দর হয়েছে।

বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, মাসীমা, আমার চাইতে দাদাকে দেখতে অনেক ভাল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলি, চুপ কর। তোকে আর আমার রূপের সার্টিফিকেট দিতে হবে না।

লিপি আমার দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলে, লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনি তো রিয়েলী ভেরি হ্যান্ডসাম।

—আপনি কী ফ্যাশন প্যারেডের বিচারক......

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শিউলি মাসিমা বললেন, শুভ, তুমি ওকে আপনি বলছো কেন? লিপি তোমরা চাইতে ঠিক এক বছরের ছোট।

বুলবুল বলল, মা, চল হোটেলে ফিরে যাই। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

মা বললেন, হ্যাঁ, চল।

আমরা হোটেলে যাবার জন্য পা বাড়াতে না বাড়াতেই শিউলি মাসিমা মাকে বললেন, চিত্রা, এখনই হোটেলে বলে দিস, কাল থেকে তোরা আর লাঞ্চ ডিনার খাবি না।

মা বললেন, তুই রোজ রোজ কেন খাবার পাঠাবি? তার চাইতে মাঝে মধ্যে বুলবুলের জন্য....

—সে চিন্তা তোকে করতে হবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, হোটেলে টাকা জমা দেওয়া না থাকলে তো তোদের আমার বাড়িতেই নিয়ে যেতাম। আমার বাড়িতে একটা ঘর তো সব সময়ই ফাঁকা পড়ে থাকে।

মা একটু হেসে বললেন, চিন্তা করছিস কেন? এর পর যখনই দার্জিলিং আসবো, তখনই তোর ওখানে উঠবো।

মাসিমা হাসতে হাসতে বললেন, একশ'বার উঠবি। আমার বাড়িতে না উঠলে তোদের দার্জিলিং'এ ঢুকতে দেব না।

আমার মামার বাড়ির পাড়াতেই শিউলি মাসীর বাপের বাড়ি। তাইতো ছোট বেলা থেকেই মা আর শিউলি মাসীর বন্ধুত্ব হয়েছে। দু'জনে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। তারপর হঠাৎ শিউলি মাসীর বিয়ে হয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যাওয়ায় দু'জনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। কয়েক বছর হলো শিউলি মাসীরা দার্জিলিং'এ এসেছেন। ওঁর স্বামী প্ল্যান্টার্স আসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। হরদম কলকাতা-দিল্লী যেতে হয়। এছাড়া প্রায়ই যেতে হয় নানা চা বাগানে। লিপি ওদের একমাত্র সন্তান।

যাইহোক পরদিন দুপুর থেকেই শিউলি মাসী বা লিপির সঙ্গে একজন নেপালী কর্মচারী দু' টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার দিয়ে হোটেলে দু'বেলা আসা-যাওয়া শুরু হল। দু'চারদিন পরই শিউলি মাসী আমাকে বললেন, শুভ, রেখা না হয় বুলবুলকে ছেড়ে বেরুতে পারছে না কিন্তু তুমি তো আমাদের বাড়ি আসতে পারো।

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে।

হ্যাঁ, পরদিন থেকেই আমি ওদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করলাম। শুরু হলো লিপির সঙ্গে মেলামেশা।

প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর স্ত্রী বলে মাসীমা দার্জিলিং-এর বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। দু'তিনটি প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী বা ভাইস প্রেসিডেন্ট। এইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নানা মহিলারা মাসীমার কাছে আসেন। এছাড়া বিভিন্ন চা

বাগানের ম্যানেজার বা তাদের স্ত্রীরাও হরদম আসেন। এইসব কারণে মাসীমাকে সত্যি ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়ি ঘরদোর সংসারের কাজকর্ম করার জন্য পাঁচজন মেয়ে-পুরুষ কর্মচারী আছে। বাড়িটিও বিশাল ; তিনটি বেড রুম, দুটি গেষ্ট রুম ছাড়াও একটা বিরাট লিভিং রুম আর একটা ছোট ষ্ট্যাডি। বাড়িতে থাকলে মেসোমশাই ঐ ষ্ট্যাডিতে বসেই কাজকর্ম করেন। অর্থাৎ ও বাড়িতে গেলে অ মাকে শুধু লিপির সঙ্গেই গল্পগুজব করে কাটাতে হয়।

আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি আর লিপি পড়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে। প্রথম দু'তিন দিন কলেজের গল্পগুজব করেই দু'এক ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েই হোটেলে ফিরে গেলাম। মাঝে-মধ্যে ও বাড়ি থেকে লাঞ্চ খেয়েই ফিরে যেতাম কিন্তু তার আগে হয়তো লিপি আর আমি একটু এদিক-ওদিকে ঘুরে আসতাম। আবার কখনও কখনও লিপি সাত সকালেই হোটেলে হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে দিতো।

সেদিন আমাদের হোটেল ঘরেই জমজমাট আড্ডা জমেছে। বাবা এসেছেন বলে শিউলি মাসী আর লিপিকে সঙ্গে নিয়ে মেসোমশাইও হাজির। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব চলতে চলতেই হঠাৎ লিপি আমাকে বলল, শুভদা, তুমি টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখেছো?

আমি একটু হেসে বলি, আমি কলকাতাতেই সূর্যোদয় দেখিনি।

বুলবুল বলে, সাড়ে সাতটায়-আটটায় ঘুম ভাঙলে কী সূর্যোদয় দেখা যায়?

মেসোমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুভ, একটু কষ্ট করেও টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখে যাও। ইউ উইল নেভার ফরগেট দ্যাট মেমোরি।

বাবা-মা প্রায় একই সঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছেন।

লিপি এবার আমার মাকে জিজ্ঞেস করে, মাসী, আপনি কি যেতে পারবেন?

—না, মা, আমি যেতে পারবো না।

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তুমি বরং শুভকে নিয়ে ঘুরে এসো।

বাবা বললেন, আমরা দু'তিনবার টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখেছি। শুভই ঘুরে আসুক।

লিপি আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে বলল, রাত তিনটেয় সময় রওনা হতে হবে। তোমার ঘুম ভাঙবে তো?

আমি নির্বিকারভাবে বললাম, না।

—তাহলে সারারাত ঘুমুতে হবে না।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

বুলবুল বলল, দাদা তো রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনা না করে ঘুমোয় না। সুতরাং তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকা ওর পক্ষে খুব কষ্টকর হবে না।

শিউলি মাসী বললেন, না, না, ওকে সারারাত জাগতে হবে না। আমি ওকে ঠিক

সময় গরম কফি খাইয়ে তুলে দেব।

এবার মেসোমশাই লিপিকে জিজ্ঞেস করলেন, কবে তোমরা যেতে চাও? কাল না পরশু?

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, সেই বুঝে আমি গুরুং'কে বলে দেব তিনটের সময় গাড়ি রেডি রাখতে।

শিউলি মাসী বললেন, ওরা কালই ঘুরে আসুক। পরশু তো আমাদের প্ল্যান্টার্স ক্লাবের পার্টি আছে।

মেসোমশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ও হ্যাঁ তাইতো!

বাবা বললেন, আমিও তো পরশু চলে যাবো। শুভ কালই ঘুরে আসুক।

যাইহোক সেদিন সন্ধ্যের পর পরই আমি ও বাড়ি চলে গেলাম। মেসোমশাই হুইস্কী খেতে খেতে দার্জিলিং এর আবহাওয়া আর চা বাগান সম্পর্কে নানা কাহিনী বললেন। মাসিমার কাছে মা'র ছোটবেলার নানা মজার কাহিনী শুনলাম। তারপর ন'টা বাজতে না বাজতেই আমাকে আর লিপিকে ডিনার খাইয়ে দেবার পরই আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, যাও শুভ, ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঠিক আড়াইটের সময় ডেকে দেব। তাছাড়া বেড সাইড টেবিলের ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া আছে।

মাসিমা যেতে না যেতেই লিপি হঠাৎ পাশের দিকের একটা দরজা খুলে একটু উঁকি দিয়ে একটু হেসে বলল, আমি ঠিক পাশের ঘরেই আছি। ভয় পেলে ডাক দিও।

আমি অবাক হলেও একটু হেসে বলি, মাই গড! তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে।

মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলি, আই ওয়াজ যাষ্ট গোয়িং টু চেঞ্জ। এভাবে হঠাৎ দরজা খোলা কী ঠিক?

লিপি কোন জবাব না দিয়েই দরজা বন্ধ করে দেয়। আমিও জামাকাপড় বদলে শুয়ে পড়ি।

রাত ঠিক আড়াইটের সময় ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজতে না বাজতেই শিউলি মাসী এক কাপ গরম কফি নিয়ে হাজির হন। আমি একটু হেসে বলি, আমাকে সূর্যোদয় দেখাবার জন্য আপনাকেও কম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না!

উনিও একটু হেসে বলেন, ছেলেমেয়েদের জন্য এইটুকু কষ্ট করতে না পারলে কী মা-মাসী হওয়া যায়?

যাইহোক গুরুং'এর গাড়িতে রওনা হবার আগে শিউলি মাসী কফি ভর্তি ফ্ল্যাক্স, ব্রেকফাষ্টের প্যাকেট ছাড়াও একটা ব্ল্যাংকেট দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে দু'জনে হাত পা ঢেকে রেখো। তা না হলে চলন্ত গাড়িতে বেশ ঠাণ্ডা লাগবে।

গুরুং গাড়ি ষ্টার্ট দেয়। আমি আর লিপি ব্ল্যাংকেট দিয়ে হাত পা ঢেকে বসি। পাঁচ-দশ মিনিট পরই লিপি জিজ্ঞেস করে, রাত্তিরে ঘুমিয়েছিলে?

—ঘুমিয়েছিলাম বৈকি।

—আমি অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম।

—কেন? ঘুম আসছিল না?

ও আমার চোখের পর চোখ রেখে একটু চাপা হাসি হেসে বলল, পাশের ঘরেই তোমার মত হ্যান্ডসাম ছেলে থাকলে কী ঘুম আসে?

আমি ওর কথা শুনে শুধু হাসি। মুখে কিছু বলি না।

লিপি হঠাৎ আমার পাশ ঘেষে বসেই কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলে, ইউ আর রিয়েলী এ ফুল!

আমি বেশ বিরক্ত হয়েই বলি, হোয়াট?

—সারারাত দরজা খোলা ছিল। একবার তো আসতে পারতে।

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। বেশ রাগ করেই বলি, দেয়ার সুড বী সাম লিমিট সামহোয়ার। ডোন্ট এক্সপেক্ট সিলি থিংগস্ ফ্রম মী।

সত্যি কথা বলতে কি ওর কথা শুনে রাগে আর ঘেন্নায় সারা মন ভরে গেল। একবার মনে হলো, গুরুংকে বলি, গাড়ি ঘোরাও। আমি এমন নোংরা মেয়ের সঙ্গে অন্তত সূর্যোদয় দেখতে চাই না কিন্তু বাবা-মা আর মাসিমা-মেসোমশায়ের কথা ভেবে চুপ করে রইলাম। কি অস্বস্তি নিয়ে যে সেদিন টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখে দার্জিলিং ফিরে এসেছিলাম, তা শুধু আমিই জানি।

আমরা সবাই জানি, নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও মিলন অত্যন্ত স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম কিন্তু তারও কিছু রীতি-নীতি নিয়ম-কানুন আছে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কিছু সংযম পালনও অবশ্য কর্তব্য। তাইতো সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া নারী-পুরুষের মিলন সভ্য সমাজে নিন্দনীয়। আমি সাধু না। আমি অতি সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার কামনা-বাসনা আছে কিন্তু সেই কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মানসিক বিকৃতি আমার হয়নি। লিপিকে বন্ধু হিসেবে ভালই লেগেছিল। ওর সান্নিধ্যে আনন্দও পেয়েছি কিন্তু সেদিন টাইগার হিল যাবার পথে ওর মানসিক বিকৃতির পরিচয় পেয়ে আমার মন ঘৃণায় ভরে গেল। সেদিনই শেষ হয়ে গেল লিপির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পর্ব!

সত্যি কথা বলতে কি আমি মন-প্রাণ দিয়ে শুধু পিয়াসাকেই ভালবেসেছি। ক্লাসের অন্য সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে আমি প্রত্যেকদিন ওর হাতে ছোট্ট একটা প্রেম পত্র গুঁজে দিয়েছি। পিয়াসা শুধু একটু হেসেছে কিন্তু একটা কথাও বলেনি। মালা বা রাত্রিকে আমি আমার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে পারলাম না।

পিয়াসা কী সাত্যকিকে ভালবাসতো? নাকি আমাকে ভালবাসে?

জানি না।

আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, পিয়াসা বোধহয় কাউকেই ভালবাসে না, ভালবাসতে জানে না।

।। পঞ্চম পর্ব।।

আবার ঘুরে ফিরে সেই দিনটি এসে হাজির। ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর আগের এই দিনটিতেই আমার পিয়া আমাদের ঘর আলো করে এই পৃথিবীতে এসেছিল। সেদিনের আনন্দ ও রোমাঞ্চের স্মৃতি আমি ভুলিনি, ভুলব না

তারপর পিয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হলো আমাদের জীবনে নতুন বসন্তোৎসব। সেই দীর্ঘদিনের স্মৃতি আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিন্তু জীবন তো শুধু আনন্দের নয়। প্রতি মানুষের মত আমার জীবনেও এসেছে দুঃখ, এসেছে বিচ্ছেদ। একে একে হারিয়েছি আমার মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়িকে। সার্থক আর পিয়াকে আকড়ে ধরেই সহ্য করেছি এই চারজন পরম প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা। শুধু তাই না। পিয়ার ঐ ঘন কালো দুটো বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়েই আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখেছি আনন্দময় মধুময় জীবনের।

পিয়াকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখার তো কারণ ছিল না। রূপে-গুণে মাধুর্যে পিয়া সত্যি অনন্যা। এমন বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ মেয়ে তো সচরাচর দেখাই যায় না। যৌবনের শুরুতে কত ছেলেমেয়েই তো কত ভুল করে কিন্তু না, আমার পিয়া মা তখন একটিও অসতর্ক পদক্ষেপ ফেলেনি। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে হেসেছে খেলেছে মিশেছে কিন্তু কখনই ভেসে যায় নি। ওর এই সংযম দেখে আমি আর সার্থক অবাক হয়ে গেছি।

শুধু কী তাই? সেকেণ্ডারী-হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে শুরু করে এম. এ. পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষায় ও অত্যন্ত ভাল ফল করেছে। মজার কথা এম. এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই ও একদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে এসে হাসতে হাসতে আমাকে বলল, মা, সোমবার আমি চাকরিতে জয়েন করবো।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কবে তুই অ্যাপ্লাই করলি আর কবে তোর ইন্টারভিউ হলো, তা তো জানতেই পারলাম না।

পিয়া দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, যাস্ট টু সারপ্রাইজ ইউ কিছুই বলিনি।

—কোথায় কীসের চাকরি পেয়েছিস?

—কন্টিনেন্টাল এয়ারওয়েজের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ।

ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বের করে আমার হাতে দেয়। আমি একবার চোখ বুলিয়েই অবাক হয়ে বলি, তুই সাড়ে সাত হাজার টাকা মাইনে পাবি?

—আমি কী স্টেট বাসের বুকিং ক্লার্ক হচ্ছি যে মাইনে কম পাবো?

—না, তা না কিন্তু...

পিয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলে, মা, আমাকে বিখ্যাত বিখ্যাত ইন্ডিয়ান আর মাল্টিন্যাশানাল ফার্মের টপ বস্‌দের সঙ্গে রেগুলার দেখাশুনা করতে হবে যাতে ওরা সবাই আমাদের ফ্লাইটে ইউরোপ যান।

ও একটু থেমে বলে, যে মেয়েটাকে লাখ লাখ টাকার বিজনেস আনতে হবে, তাকে সাড়ে সাত হাজার টাকা মাইনে দেবে না?

আমি একটু হেসে জিজ্ঞেস করি, তুই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার যোগাড় করতে পারবি?

—না পারার কী আছে?

মলিনাদি ঠিক সেই সময় বাথরুম থেকে বেরুতেই ও দৌড় গিয়ে চিৎকার করে বলে, পিসী, আমি চাকরি পেয়েছি। সাড়ে সাত হাজার টাকা মাইনে।

খবরটা শুনে মালিনাদি চমকে ওঠে, বলিস কীরে? তোর মত একটা বাচ্চা মেয়েকে এত টাকা মাইনে দেবে?

পিয়া হাসতে হাসতে বলল, তোমার হাতের রান্না খাই বলে ওরা এর চাইতে কম মাইনে দিতে পারলো না।

সার্থক অফিস থেকে ফেরার পর সবকিছু দেখেশুনে হাসতে হাসতে পিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, মা জননী, তুই এত টাকা দিয়ে কী করবি?

—আমরা সবাই মিলে এই ক'টা টাকা ওড়াতে পারবো না?

যাইহোক পরের সোমবার থেকেই পিয়ার নতুন জীবন শুরু হলো।

সপ্তাহ খানেক পরই একদিন বিকেলের দিকে মৈনাক এক বাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করেই একটু হেসে বলল, মাসিমা, আমি আই-এ-এস পরীক্ষায় পাশ করেছি। আশীর্বাদ করবেন যেন ইন্টারভিউতেও পাশ করি।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা করে কপালে একটা চুমু খেয়ে বললাম, তোমার মত সোনার টুকরো ছেলে ইন্টারভিউতে পাশ করবে না, তাই কখনো হয়?

—মাসিমা, ছেলেমেয়েরা যত ভালই হোক, বাবা-মা মাসী-পিসীদের আশীর্বাদ না

পেলে তো কোন কিছুই সম্ভব না।

মলিনাদি পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি একটু হেসে বলি, আমাদের মৈনাক তো ম্যাজিস্ট্রেট হতে চলেছে।

মলিনাদি এক গাল হাসি হেসে বলে, বাঃ! খুব ভাল খবর।

মৈনাক একটু হেসে বলে, পিসী, আরো একটা পরীক্ষা বাকি আছে।

—ও তুমি ঠিক পাশ করে যাবে।

পিয়া এসে খবরটা শুনেই ওকে অভিনন্দন জানালেও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, আই-আই-এম 'এর পরীক্ষায় পাশ করলে কী করবে?

—ইউ-সি-এস-সি'র ইন্টারভিউতে পাশ করলে বোধহয় আর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়বো না।

—কেন?

—আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করলে মা বোধহয় বেশি খুশি হবেন। তাই বোধহয়...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলি, তোমাদের মত ভাল ছেলেরা আই-এ-এস বা আই-পি-এস হলে গভর্নমেন্টের চেহারাই বদলে যাবে।

চা-টা খেতে খেতেই মৈনাক পিয়াকে জিজ্ঞেস করে, অন্যান্য বন্ধুদের খবর জানো?

—কার খবর জানতে চাও?

—মাধুরী, শুভ, বাল্মীকি...

—পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন থেকেই বাল্মীকি ওদের পানিহাটির কারখানায় যাচ্ছে। শুভ বোধহয় ডক্টর মজুমদারের আন্ডারেই রিসার্চ করবে আর মাধুরী চাকরির জন্য কি সব পরীক্ষা-টরিক্ষা দিচ্ছে।

—মাধুরীও কী অ্যালায়েড সার্ভিসেসের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল?

পিয়া একটু চাপা হাসি হেসে বলল, ঠিক জানি না।

মৈনাকও একটু হেসে বলে, তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছো।

—তুমি কী পরীক্ষা দেবার আগে আমাদের কাউকে কিছু জানিয়েছিলে?

—যদি ফেল করি সেই ভয়ে কাউকে কিছু বলিনি।

—সে ভয় তো আরো অনেকের মনে থাকতে পারে।

মৈনাক সঙ্গে সঙ্গে বলে, তবে আমি বলে দিচ্ছি, যদি মাধুরী পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে ও নিশ্চয়ই পাশ করবে।

ও মুহূর্তে জন্য থেমেই বলে, তবে সাগর যে প্রিলিমিনারীতেই ফেল করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

পিয়া একটু হেসে বলে, দিনরাত রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকলে কী এইসব পরীক্ষায় পাস করা যায়?

—পলিটিক্স করলেও সাগরের মত ব্রিলিয়ন্ট ছেলে ক'জন দেখেছ বলো?

পিয়া হাসতে হাসতে বলল, ব্রিলিয়ন্ট ছেলেমেয়েরাই তো বাস্তব জীবনে বেশি ব্যর্থ হয়।

এসব বেশ কয়কে বছর আগেকার কথা। গত বছর দশেকের মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অনেক কিছু ঘটে গেছে এই সময়ের মধ্যে। মৈনাক এখন মালদ'র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। হাতিবাগান বাজারের সামান্য দোকানদারের মেয়ে মাধুরী এখন কায়রোর ইন্ডিয়ান এম্বাসীও সেকেন্ড সেক্রেটারী। শুভ জলপাইগুড়ির আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক আর বাল্মীকি নিজে হলদিয়ায় নতুন কারখানা খুলেছে। সাগর পলিটিক্স ছেড়ে মাষ্টার হয়েছে। ওদিকে মালা সংসার সামলেও কলেজে পড়াচ্ছে।

পিয়ার প্রায় সব বন্ধুবান্ধবদেরই বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়েও হয়েছে। বিয়ে করেনি শুধু মৈনাক আর মাধুরী। মৈনাক কিছু প্রকাশ না করলেও মাধুরী তো প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না।

সে যাইহোক আমি আমার মেয়ের ব্যাপারটা ভেবেই অবাক হয়ে যাই। এত ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বে ও যে কি করে অভিমন্যুর মত একটা মাতাল চরিত্রহীন ছেলেকে বিয়ে করলো, তা আমি ভেবে পাই না।

হ্যাঁ, অভিমন্যু নিশ্চয়ই সুদর্শন স্বাস্থ্যবান ও কোয়ালিফায়েড কিন্তু ও যে মাতাল ও অনেক মেয়ের সঙ্গেই ওর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল তা কী পিয়া জানতো না? ওর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে কিছুই বুঝতে পারেনি, জানতে পারেনি, তা আমার বিশ্বাস হয় না। পিয়া কী ওর রূপ দেখে, কথাবার্তা শুনে আর মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে ভাল চাকরি করে বলেই ওকে বিয়ে করেছিল? নাকি...

নিজের মেয়ের সম্পর্কে ভাবতে গিয়েও দ্বিধা হয় কিন্তু তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, বিয়ের আগেই কী ওদের মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? নাকি নিছক মেলামেশা করতে করতেই ভালবাসার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না, কোনদিন জানবোও না।

তবে অভিমন্যুকে আমার কোনদিনই ভাল লাগে নি। রূপ, যৌবন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলে তাঁর প্রচ্ছন্ন অহংকার শুধু আমার না, সার্থকেরও ভাল লাগেনি। তাছাড়া বিয়ের সময় দাদা-বৌদিরা এলেও ওর বাবা-মা না আসায় আমার মনে হয়েছিল, কোন বিশেষ কারণে ওরা তাদের ছোট ছেলেকে পছন্দ করেন না। পরবর্তী কালে বুঝেছি, অভিমন্যুর স্বার্থপরতা ও স্বভাব-চরিত্রের জন্যই মা-বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে।

পিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বড্ড বেশি চাপা স্বভাবের। তাইতো আমাকে কিছু না

বললেও বিয়ের বছর খানেক পরই আমি বুঝেছিলাম, অভিমন্যু সম্পর্কে ওর মোহভঙ্গ হয়েছে। আবার ওদের হেসেখেলে জীবন কাটাতে দেখে মনে হয়েছে, বোধহয় মেঘ কেটে গেছে। এইভাবে চলতে চলতেই পিয়ার পেটে পূজা এলো, পূজা হলো কিন্তু নার্সিং হোমে অভিমন্যুর অনিয়মিত আসা-যাওয়া দেখেই সার্থক আমাকে বলেছিল, বেগম, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, পিয়া আর বেশিদিন এই ছেলেটোর সঙ্গে ঘর করতে পারবে না।

নার্সিং হোম থেকে আমরা পিয়া আর পূজাকে নিয়ে বাড়ি এলাম। অভিমন্যু কাজের চাপের অছিলায় সপ্তাহে দু'একদিনের বেশি কখনোই আসতো না ; ও এলেও দশ-পনের মিনিটের বেশি কখনই আমাদের বাড়িতে থাকতো না। পূজা মাস তিনেকের হবার পর পিয়া ওদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে চলে গেল কিন্তু পূজা আমাদের কাছেই রইলো। সারাদিন কাজকর্মের পর পিয়া রোজ ওর মেয়ের কাছে ছুটে আসতো। খাওয়া-দাওয়ার পর ফিরে যেতো রাত সাড়ে দশটা-এগারোটায়। অভিমন্যু কদাচিৎ কখনও মেয়েকে দেখতে এলেও মেয়ের প্রতি যে তার বিশেষ স্নেহ-ভালবাসা ছিল, তা কখনই আমার মনে হয়নি। পূজা সম্পর্কে অভিমন্যুর ঔদাসীন্য দেখতে দেখতে সার্থক তো একদিন পিয়াকেই বলল, যে নিজের সন্তানকে ভালবাসে না, সে রকম স্বামীকে নিয়ে যে কী করে তুই ঘর করছিস, তা আমি ভেবে পাই না। তুই হবার পর তো আমি আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

পিয়া চুপ করে সব শুনেছিল ; মুখে একটি কথাও বলেনি।

মজার কথা অভিমন্যুর দাদা-বৌদি প্রত্যেক রবিবার পূজাকে দেখতে আসতেন। ঐ ছোট্ট শিশুর জন্য কত কি উপহার আনতেন ও দু'জনেই প্রাণভরে আদর করতেন।

পিয়ার পুরনো বন্ধুবান্ধবরা সময় পেলেই পূজাকে দেখতে আসতো, আদর করতো ও কত কি উপহার আনতো। তবে পূজাকে সব চাইতে বেশি ভালবাসে, স্নেহ করে মৈনাক আর মালা। মালা যখনই সময় পায়, তখনই নিজের ছেলেকে নিয়ে চলে আসে। আর মৈনাক একদিনের জন্যও কলকাতা এলে অন্তত দু'এক ঘন্টা পূজার সঙ্গে খেলাধূলা করার জন্য ছুটে আসবেই। চলে যাবার সময় মৈনাক সব সময় আমাকে আর পিয়াকে বলে, এত তো ঘুরে বেড়াই কিন্তু নতুন মা'র মত এত সুন্দর, এত মিষ্টি মেয়ে আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ল না। কলকাতা বা তার আশেপাশে পোস্টিং পেলে রোজ একবার নতুন মাকে দেখতে পারতাম।

সে যাইহোক পূজার প্রথম জন্মদিনের ঠিক আগের দিন পিয়া নিজের সব জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের এখানে এসেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অভিমন্যুর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলাম।

পিয়া আমাদের কিছু না বললেও মালাকে বলেছিল, আমার বাড়িতে আমার সামনে সুদক্ষিণা বলে ওর অফিসের একটা মেয়েকে নিয়ে অভিমন্যু এমন বেলেল্লাপনা শুরু

করেছিল যে আমি চলে আসতে বাধ্য হলাম।

শুধু পিয়ার না, আমার আর সার্থকেরও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মেয়ে আর নাতনী দু'জনকে নিয়েই দুঃশ্চিন্তায় আমরা রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না।

আমাদের এই পারিবারিক বিপর্যয়ের পরও সূর্যদেব ঠিক সময় আত্মপ্রকাশও করছেন, আত্মগোপনও করছেন। পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় ভেসে যায় পৃথিবী। নির্মম উদাসীন সময় এগিয়ে চলে আপন খুশিতে। ঋতুর পর ঋতু পরিবর্তন হয়। পিয়া পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে সরিয়ে রেখে আবার হাসে খেলে গুণ গুণ করে গান গায়। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে। আমি আর সার্থক একটু খুশি হই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পিয়া আর পূজার ভবিষ্যতের কথা ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলি।

ওদিকে কোর্ট-কাছারির পর্ব গজ-কচ্ছপের গতিতে চলতে চলতে একদিন জজ সাহেব ঘোষণা করলেন, সামনের শুক্রবার রায় দেবেন।

হ্যাঁ, শুক্রবার জজ সাহেব রায় দিলেন। ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলো কিন্তু কোর্ট থেকে বাড়ি এসেই পিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, মা, তুই আর জীবনে কাউকে বাবা বলে ডাকতে পারবি না।

কী আশ্চর্য! পরের দিন সকালে মৈনাক এসে হাজির। আমাকে প্রণাম করেই বলল, মাসিমা, আমার মা এসেছেন।

—কোথায় তিনি?

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সার্থক হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি ওকে বললাম, মৈনাকের মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি ওনাকে ভিতরে নিয়ে এসো।

তারপর?

তারপর মৈনাকের মা দু'হাত দিয়ে পিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মাগো, তুমি কী জানো না, আমার ছেলেটা শুধু তোমার জন্য এতকাল অপেক্ষা করছে? লক্ষ্মী মা আমার, তুমি আর ওকে দূরে সরিয়ে রেখো না।

পিয়া কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কিন্তু মাসিমা...

মৈনাকের মা সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের উপর হাত দিয়ে একটু হেসে বললেন, আমি তোমার মাসিমা না, মা।

পিয়া ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলে, মা!

আনন্দে আর খুশিতে আমার আর সার্থকের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।